

# মুক্তচিন্তা ও ইসলাম

(মুক্তচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)

মুজাজ্জাজ বাগ্মি



## সূচিপত্র

<b>মুক্তচিন্তা পরিচিতি</b>	<b>১৭</b>
◇ মুক্তচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ	১৭
◇ প্রচলিত সংজ্ঞা পর্যালোচনা	২১
◇ মুক্তচিন্তা ও সংশয়	২৫
◇ মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্য	৩৪
<b>প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা</b>	<b>৩৮</b>
◇ চিন্তার পরমমুক্তি : একটি অবাস্তব কল্পনা	৩৯
◇ আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা ও চিন্তা-পদ্ধতি	৪৪
◇ আপেক্ষিক মুক্তচিন্তার মানদণ্ড	৪৫
◇ অভিজ্ঞতা	৪৬
◇ বুদ্ধি	৪৯
◇ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সমন্বয়	৫০
◇ বিজ্ঞান	৫৩
◇ বিশ্বাস	৬৪
◇ ওহি	৬৬
◇ উপসংহার	৭১
<b>মুক্তচিন্তা বনাম শুদ্ধচিন্তা</b>	<b>৭৩</b>
<b>মুক্তচিন্তা ও ধর্মহীনতা</b>	<b>৮০</b>
◇ অজ্ঞেয়বাদ	৮১
◇ নাস্তিকতা	৮৩
◇ স্রষ্টার জন্য প্রমাণ অনাবশ্যক	৮৯
◇ নাস্তিকতা অপ্রমাণিত	৯৩

◇ স্রষ্টা মহাবিশ্বের অনস্বীকার্য বাস্তবতা	৯৪
◇ অভিজ্ঞতায় স্রষ্টা	১০৯
◇ ঈশ্বরবাদ	১২৯
◇ উপসংহার	১৩০

## জ্ঞানচর্চায় ইডেবোপের মৌলিক ভ্রান্তি ১৩১

◇ গ্রিক সভ্যতার সর্বাত্মক অনুকরণ	১৩২
◇ অস্থির মনোবৃত্তি	১৩৫
◇ অপ্রতুল গবেষণা	১৩৯
◇ উদ্দেশ্য প্রণোদিত গবেষণা	১৪৯
◇ চেতনায় বস্তুবাদ	১৫৩

## মানব অনুসন্ধানের ব্যর্থতা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ১৫৮

◇ বিজ্ঞানের নীরবতা	১৬০
◇ দর্শনের জটিল অনুসন্ধান	১৬৫
◇ ধর্মের সরল জবাব	১৭০

## ইসলাম মুক্তচিন্তার একটি মানদণ্ড ১৭৬

◇ নিরেট বিশ্বাসের স্থান	১৭৯
◇ বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগোপথ	১৮২
◇ উন্মুক্ত চিন্তার ময়দান	১৮৪
◇ সুন্নাহর প্রকারভেদ ও পালনের বিধান	১৯০

## ইসলামে মুক্তচিন্তা ১৯৫

◇ কুরআনুল কারিমে মুক্তচিন্তা	১৯৫
◇ সিরাতুন নবি ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে মুক্তচিন্তা	২০৪
◇ ইসলামি চিন্তা-পদ্ধতিতে মুক্তির নিদর্শন	২১১
◇ নীতিনির্ধারণী পন্থা : উসুলুল ফিকহ	২১১
◇ উসুলুল হাদিস : তথ্য যাচাইয়ের অভূতপূর্ব শাস্ত্র	২১৮

◇ ইলমুল কালাম : বিশ্বাসের যৌক্তিক মানদণ্ড	২৩৩
◇ মানতিক : যুক্তির শাস্ত্রীয় বিকাশ	২৩৮
◇ মুনাজারা : বিতর্কের ব্যবহারিক রূপ	২৪১

## মুসলিম মানসে মুক্তচিন্তা ২৪৩

◇ ইখতিলাফ : মুক্তচিন্তার অনিবার্য পরিণতি	২৪৩
◇ পরমত সহিষ্ণুতা : মুক্তচিন্তার পূর্বশর্ত	২৫২
◇ পরিশুদ্ধ চেতনা	২৫৫

## পুনশ্চ ২৫৯

## গ্রন্থপন্ঠি ২৬৩

## মুক্তচিন্তা পরিচিতি

### মুক্তচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ

মুক্তচিন্তা বা মুক্তবুদ্ধি ইংরেজি ‘Freethought’-এর অনুবাদ। মুক্তচিন্তা মূলত একটি পাশ্চাত্য ধারণা, তবে এর প্রভাব কেবল পাশ্চাত্যে সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চাত্যের সীমা ছাড়িয়ে এটি এখন একটি বৈশ্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। আবুল হুসেন, আব্দুল ওদুদ ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’-এর হাত ধরে ব্রিটিশ আমলেই আমাদের দেশে মুক্তবুদ্ধির ধারণাটি প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিবর্তন ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে এ দেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে ‘মুক্তচিন্তা’ পরিভাষাটি।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আধুনিক বাংলা অভিধানে ‘মুক্তচিন্তা’র অর্থ করা হয়েছে— ‘সংকীর্ণতা বিবর্জিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব’ আর ‘অসাম্প্রদায়িক’ শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, ‘বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা দল সম্পর্কে নিরপেক্ষ, সর্বজনীন।’ মোটকথা, বাংলা একাডেমির অভিধানে মুক্তচিন্তাকে স্বাভাবিক অর্থে উদারতা বোঝানো হয়েছে।

শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থের বিচারে অনুবাদটি যথার্থ, তবে ব্যবহারিক বিচারে এটি Freethinking-এর একটি দুর্বল অনুবাদ মাত্র। বিগত কয়েক শতকে শব্দটি যে ভাবমূর্তি ধারণ করেছে, তা কেবল ‘সংকীর্ণতামুক্ত’ বা ‘অসাম্প্রদায়িক’ শব্দে প্রকাশ পায় না। ইংরেজি অভিধানগুলোতে চোখ বোলালে এর বাস্তবতা সহজেই ধরা পড়ে; এর জন্য আহামরি কোনো গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না।

Oxford Advanced Learners Dictionary-তে Freethinker-এর অর্থ বলা হয়েছে—

‘অন্যের ধারণা ও মতামত গ্রহণের পরিবর্তে যারা নিজেদের ধারণা ও অভিমত প্রতিষ্ঠা করে (বিশেষত ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে)।’

অভিধানটির অনলাইন সংস্করণে Freethinker-এর অর্থ বলা হয়েছে—

‘যারা প্রতিষ্ঠিত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে; বিশেষ করে যেগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয়।’

একই অভিধানে এর সমার্থক শব্দের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে Nonconformist, Dissenter, Heretic, Libertine, Agnostic, Atheist, Unbeliever, Disbeliever, Sceptic, Doubter শব্দগুলোকে। বিপরীত শব্দের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে Conformist ও Believer-এর মতো শব্দ দুটিকেও।

*Merriam Webster Dictionary*’র কথা বলি; চিত্র এখানেও অভিন্ন। শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—

‘প্রথাবিরোধী আচরণ বা বিশ্বাস; বিশেষত অষ্টাদশ শতকের ঈশ্বরবাদ।’

*Longman Dictionary*-তেও মোটামুটি একই কথা বলা হয়েছে—

‘অন্যের অভিমত, ধারণা ও বিশ্বাস গ্রহণের পরিবর্তে যাদের নিজের অভিমত, ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে।’

এভাবে প্রচলিত প্রায় সবকটি ইংরেজি অভিধানে শব্দটির যে অর্থ করা হয়েছে, তা কেবল সংকীর্ণতামুক্ত চিন্তাকে নির্দেশ করে না; বরং ধর্মবিরোধিতাও প্রকাশ করে। এখন অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ‘মুক্তচিন্তা’র অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘ধর্মহীনতা’, উদারতার পরিবর্তে এটি নির্দেশ করছে এক বিশেষ ধরনের কল্পিত উদারতা— যার শেষকথা ধর্মে অবিশ্বাস।

আলোচনার পূর্ণতার জন্য শব্দটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ইংরেজি সাহিত্যে Freethinking বা Freethought শব্দ দুটোর প্রচলন শুরু হয় সপ্তাদশ শতকের শেষার্ধ্বে। অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অক্সফোর্ড অভিধানের অনলাইন সংস্করণ থেকে যদুর বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেই শব্দটির প্রচলন শুরু হয়। *Merriam Webster Dictionary*-তে অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ।

*Short History of freethought, ancient and modern* গ্রন্থাকার রবার্টসন (J. M. Robertson) শব্দটির মূলের সন্ধানে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“‘মুক্তচিন্তা’ ও ‘মুক্তচিন্তক’ শব্দ দুটো ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম চোখে পড়ে সপ্তাদশ শতকের শেষের দিকে। এ সময়েই শব্দটার উৎপত্তি বলে ধারণা করা যায়। কারণ, ইতঃপূর্বে ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষায় আমরা এর এমন কোনো ব্যবহার দেখতে পাই না—যেখানে শব্দটির বিষয়বস্তুর উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।”

<sup>১</sup> J. M. Robertson, *A Short History of Freethought ancient and modern*, London 1899, v.1, p.8

নির্দিষ্ট নামকরণেরও বহু পূর্ব থেকে ইউরোপীয় চিন্তাঙ্গনে মুক্তচিন্তার চর্চা দৃষ্টিগোচর হয়। ধর্মাস্ক ও গোঁড়া সামাজিক বাস্তবতায় সংকীর্ণতা ছেড়ে যিনিই ধর্ম সম্পর্কে একটু-আধটু বুঝতে চেয়েছেন, তিনিই নিজেকে মুক্তচিন্তক বলে প্রচার করেছেন। মার্টিন লুথারের ‘ধর্মসংস্কার’ আন্দোলন চার্চ কর্তৃক নিষ্পেষিত ইউরোপের জনজীবনে এক নতুন ধারা এনে দিয়েছিল এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রথাবিরোধী এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছিল। এরই অনিবার্য পরিণতিতে ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে, সৃষ্টি হয় অসংখ্য মতবাদের।

আধুনিকতা ও উদারতার দোহাই দিয়ে অথবা প্রকৃতপক্ষেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা ন্যূনতম সংশয় প্রকাশ করা ছিল তখনকার সমাজের একটা সাধারণ চিত্র। জটিল এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে যেসব মতবাদ জন্ম নেয়, দল-উপদল সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবগুলোই ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটিকে আশ্রয় করে একটি সাধারণ পরিচিতি গ্রহণ করে। তাদের গন্তব্যের মাঝে ভিন্নতা ও বৈপরীত্য থাকলেও সূচনায় একটি বিশেষ মিল ছিল; তারা সবাই ছিল পাদরিদের বিরুদ্ধে, খ্রিষ্টধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। এই পর্যায়ে মুক্তচিন্তা শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সাধারণভাবে গোঁড়ামির বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে।

রবার্টসনের মতে, শব্দটির প্রথম ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় ৬ এপ্রিল, ১৬৯৭ সালে দার্শনিক জন লককে লেখা উইলিয়াম মলিনাক্স-এর একটি পত্রে। তিনি সেখানে টোনাড সম্পর্কে বলেন—‘I take him to be a candid freethinker and a good scholar.’ ২৪ ডিসেম্বর, ১৬৯৫-এ লেখা পূর্বের অপর একটি পত্রে তিনি একটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থকে ‘স্বাধীন চিন্তার অভাব’ বলে মন্তব্য করেন।

শব্দটিকে পুরোপুরি ধর্মীয় অবিশ্বাস বা সাংঘর্ষিক অর্থে পাওয়া যায় জনাথন সুইফটের ‘Sentiments of church of English Man’ নামক থিসিস পেপারে। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন—

‘নাস্তিক, চরিত্রহীন লম্পট, ধর্মবিদ্বেষী—বলতে গেলে সবাই মুক্তচিন্তক পরিচয়ে পরিচিত হয়।’<sup>২</sup>

১৭১৩ সালে এন্থনি কলিংস (Anthony Collings)-এর *A Discourse of Freethinking* গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে অবশ্য এই শব্দটি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। গ্রন্থটি Freethinking শব্দটিকে একটি ভিন্নমাত্রা দান করে। ফলে প্রথমবারের মতো এটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

কলিংসের মুক্তচিন্তা ছিল মূলত ঈশ্বরবাদ<sup>৩</sup> (Deism)। গ্রন্থটিতে তিনি নাস্তিকতার চরম বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মূর্খতাকেই নাস্তিকতার ভিত্তি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন—

‘অজ্ঞতাই নাস্তিকতার ভিত্তি, মুক্তচিন্তাই কেবল এর প্রতিষেধক।’<sup>৪</sup>

<sup>২</sup>. প্রাগুক্ত, ১-৩ পৃ.

<sup>৩</sup>. যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, কিন্তু বিশেষ কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন, তারা মনে করেন—ঈশ্বর সৃষ্টি করার পরে সৃষ্টজগৎ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সৃষ্টি থেকে তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই।

<sup>৪</sup>. Anthony Collings, *A Discourse of freethinking*, p.105

১৭১৮ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় Freethinker শিরোনামে। এটি ছিল পুরোপুরি কলিঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত; সেখানে ধর্মবিরোধী কোনো প্রবণতা ছিল না। আরও জটিল তথ্য হচ্ছে, সাপ্তাহিকীটির পরিবেশকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশপ বার্নেটের (Gilbert Burnet) পুত্র বাটলার (Joseph Butler); যিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে ডাবলিনের আর্কবিশপ হয়েছিলেন।

এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়—শব্দটিকে ধর্মবিরোধী রূপ দেওয়ার চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি ধর্মবিরোধিতার পরিবর্তে ধর্মসংস্কার অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টাও অব্যাহত ছিল। রবার্টসনের গবেষণায় একই চিত্র ফুটে উঠেছে—

‘ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলোতে কুসংস্কার থেকে মুক্তির পরিচায়ক হিসেবে “মুক্তচিন্তা” শব্দটিকে রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও নাস্তিকতার সমর্থক হিসেবে একে বিশেষায়িত করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল।’<sup>৫</sup>

### প্রচলিত সংজ্ঞা পর্যালোচনা

এতক্ষণ আমরা ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখানে আমরা দেখলাম, সাধারণ গোঁড়ামির বিপরীতার্থক একটা শব্দকে কীভাবে ধর্মের বিপরীতার্থের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা মুক্তচিন্তার প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করব।

পেছনের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ মোটেও নাস্তিকতা ছিল না। শুরুর দিকে যারা মুক্তচিন্তার অগ্রদূত ছিলেন, তাদের অনেকেই নাস্তিকতার চরম বিরোধীও ছিলেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এন্টনি কলিঙ্গ; তিনি নাস্তিকতাকে মূর্খতা বলে অভিহিত করে মুক্তচিন্তাকে এর প্রতিষেধক সাব্যস্ত করেছেন। কলিঙ্গ অবশ্য চার্চেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন।

কলিঙ্গের মতো তখনকার প্রায় সব পশ্চিমা গবেষক ধর্মের সংশোধন চাইতেন, চার্চের লাগামহীন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কামনা করতেন। এ অর্থেই তারা মুক্তচিন্তক। তাদের দ্বন্দ্ব ছিল চার্চের পাদরির সাথে; স্রষ্টার সাথে নয়, ধর্মের সাথেও নয়। তবে এ দ্বন্দ্বের পরিণতি যেমন পাদরি পর্যন্ত থেমে থাকেনি; বরং কালের পরিক্রমায় ধর্মবিদ্বেষের রূপ ধারণ করেছে, তেমনি মুক্তচিন্তার ধারণাও কেবল ধর্মসংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ‘মুক্তচিন্তা’ অর্থ এখন ‘ধর্মের বন্ধন হতে মুক্তি’। ধর্মহীনতাই এখন মুক্তচিন্তার মানদণ্ড। ভাবখানা এমন হয়েছে— যেন ধর্ম থেকে যে যত দূরে, সে তত মুক্তচিন্তক!

<sup>৫</sup>J. M. Robertson, *Short History of freethought, ancient and modern*, London 1899, p.12



## প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা

মুক্ত অর্থ বাধাহীন। একটা বস্তুকে মুক্ত বলা যায় তখনই, যখন সে সবদিক থেকে বাধাহীন হয়ে যায়। একটা ঘুড়িকে মুক্ত বা স্বাধীন বলা যায় না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ইচ্ছামতো বাতাসে ওড়ে। নাটাইয়ে যুক্ত সুতাটা তার ‘মুক্ত’ বিশেষণটি কেড়ে নিয়েছে। সুতা ছিঁড়ে গেলে আপনার কাছে হয়তো মুক্ত মনে হবে, যদিও বাতাসের প্রভাব তখনও বহাল থাকে। অথচ বাস্তবিক অর্থে মুক্ত হতে হলে বস্তুর ন্যূনতম বন্ধন থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যিক। কাজেই ঘুড়িটা স্বাধীনভাবে উড়ছে—এ কথা বলতে হলে প্রথমে ঘুড়িকে নাটাইয়ের বন্ধনমুক্ত হতে হবে। তারপর এমন সব প্রতিকূল আবহাওয়া থেকেও মুক্ত হতে হবে, যা তার স্বাধীনতার পক্ষে বাধা হয়। তবেই বলা যাবে, ঘুড়িটি পূর্ণ স্বাধীনতায় উড়ছে। অবশ্য এ অবস্থায় ঘুড়িটি উড়বে কি না, সেটিও একটা প্রশ্ন।

এখানে ঘুড়িটির নাটাই থেকে মুক্ত হওয়া ছিল আপাত মুক্তি। মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে একে মুক্তিই মনে করে। একে আমরা আপেক্ষিক মুক্তি বলতে পারি। অন্যদিকে বাতাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াকে আমরা প্রকৃত মুক্তি বলতে পারি।

ব্যবহারিক ও বাস্তবিক অর্থের অস্পষ্টতা কখনো কখনো বিভ্রাট সৃষ্টি করে, কখনো অনেক বড়ো সত্যকেও গোপন করে। একটি উদাহরণ দিই—কোনো উঁচু স্থান থেকে একই সঙ্গে একটা লোহার গোলক এবং কিছু পাখির পালক মাটিতে ফেলা হলো। ফলাফল সকলের জানা, পাখরটি মুহূর্তের মধ্যেই মাটিতে পড়বে আর পালকগুলো উড়তে থাকবে; পরে একসময় বাতাসের বাধাকে অতিক্রম করে মাটিতে পড়বে। বস্তু দুটিকে ওপর থেকে চাপ দেওয়া হয়নি, নিচে থেকে টানাও হয়নি। এ অর্থে দুজনই মুক্ত। তাহলে বোঝা গেল, আবার দুটি বস্তুকে ওপর থেকে স্থির অবস্থায় ছেড়ে দিলে যে বস্তুর ভার বেশি, সে আগে মাটিতে পড়বে।

যুগ যুগ ধরে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এর বিপরীত ছিল না। অথচ এটি একটি চরম ভুল, বড়ো মিথ্যাচার। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo Galilei) এ সত্যকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন—

‘স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।’ অর্থাৎ ওপর থেকে ছেড়ে দিলে লোহার গোলক ও পালক একই সাথে মাটিতে পড়ে। আমরা যে উলটোটা দেখি, তার জন্য তিনি বাতাসকে দুষলেন। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত দেখালেও বস্তু দুটি মুক্ত না, বাতাস এখানে প্রভাবক ও প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। বায়ুমুক্ত পরিবেশে (vacuum) পরীক্ষা করলে এর সত্যতা মেলে, তবে স্থূল দৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলে বলতে হবে, গ্যালিলিও মূলত আপেক্ষিক ও প্রকৃত মুক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দুটি বস্তুকে বাধাহীন ছেড়ে দেওয়া ছিল আপেক্ষিক অর্থে মুক্ত, আর বায়ুর প্রভাবকেও সরিয়ে ফেলা হলো বাস্তবিক মুক্তি। ছোটো একটি অর্থবিভ্রাট একটি বড়ো সত্যকে ঢেকে রেখেছিল। একই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে মুক্তচিন্তার ধারণাতেও। মুক্তচিন্তার সংজ্ঞা নির্ধারণে এই বিভ্রাট থেকে বেরোতে পারেননি বড়ো বড়ো চিন্তাবিদরাও। মুক্তচিন্তার ধারণায় এ মৌলিক ভ্রান্তির ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক। এর ফলে মুক্তচিন্তা পরিভাষাটির ওপর নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সূচনা হয়েছে। কাজেই এ আলোচনার শুরুতে আমাদের প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যিক।

### চিন্তার পরম মুক্তি : একটি অবাস্তব কল্পনা

কোনো বস্তুকে প্রকৃত অর্থে মুক্ত বলতে হলে তাকে সকল বাধা ও আবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে হবে। উপরন্তু এমন সবকিছু থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যিক—যা সরাসরি বাধা নয়, তবে প্রভাবক। দুইয়ের একটির উপস্থিতিতেও বস্তুকে পরম অর্থে মুক্ত বলা যায় না। পালক ও লৌহ গোলকের পরীক্ষা থেকে আমরা ইতোমধ্যেই এটি নিশ্চিত হয়েছি।

চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের চরম ও পরম মুক্তি অসম্ভব। চিন্তা-ভাবনা একটি জটিল প্রক্রিয়া। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, রুচি, মননশীলতা প্রভৃতি বহু উপাদানের সমন্বিত রূপ এটি। চিন্তা বা বুদ্ধি মানুষের কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও নয়; বরং ব্যক্তির সকল অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি সমন্বিত ফলাফল। এজন্য একই ঘটনা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি তৈরি করে। কারণ, তত্ত্বে-তথ্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলে সমান নয়।

ষাটোখর কোনো ব্যক্তি যখন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, তখন তার পেছনের ষাট বছরের সব অর্জন, তথ্য, বুদ্ধি, ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এজন্য মানুষের ছোটো কোনো সিদ্ধান্তকেও পেছনের ষাট বছর থেকে পৃথক করার উপায় নেই। এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া সাধ্যের অতীত। আহমদ হুফা যথার্থই বলেছেন—

‘বস্তুত রহস্য ভেদ করার জন্য যে ধরনের শীলিত বুদ্ধির প্রয়োজন, তা অনেকের থাকে না, নানা কিছুই বুদ্ধির সতীত্ব হরণ করে। বংশক্রম, শ্রেণি, পেশা, জলবায়ু, দেশ, কাল, ধর্ম

এবং রাষ্ট্র—সবকিছু একযোগে বুদ্ধির সতীত্ব নাশ করার মানসে ওত পেতে রয়েছে। সেগুলো চিকন চিকন লতার নাগপাশের মতো বুদ্ধির শীর্ষ এ পাশে নাহয় ওপাশে হেলিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যপ্রদ সূর্যালোকে অভিসার করতে পারে না। এসব কিছুর দড়াদড়ি ছিঁড়ে বুদ্ধিকে প্রাকৃতিক সত্যের মতো করে বিকশিত করাই হলো বিজ্ঞানবুদ্ধি। মানুষ কি বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে? প্রখর ইচ্ছে দিয়ে চেষ্টা করলেও পরিশীলন সে আনতে পারে? জন্ম ও মৃত্যুর পরাক্রান্ত সীমানা মেনে নিয়ে কাজে নামতে হয়। তার জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। যে মানুষের খেয়াল-খুশিতে তার জন্ম, তাদের কাছ থেকে পাওয়া রক্তধারার মধ্যদিয়ে সে তাদেরই সংস্কারের বিজাণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে অসহায় মানবশিশু মা-বাপ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে স্নেহ, প্রেম, রাগ, অনুরাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিপ্লবের মাধ্যমে যা গ্রহণ করে, সেসব সংস্কারের জাল তাকে আটকে ধরে।<sup>৬</sup>

ছফার এ অনুধাবন সকলের ক্ষেত্রেই কমবেশি সত্য। আন্তিক-নাস্তিক, গোঁড়া-উদার নির্বিশেষে সবাই এ রোগে আক্রান্ত। কারণ, এ রোগ মানুষের সত্তাগত।

খোদ বার্ট্রান্ড রাসেল সম্পর্কে আহমদ ছফার উক্তি—

‘খুব ছোটো বয়সে রাসেল মা-বাবা দুজনকে হারান। তাই পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয়ে তাকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। তারা প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করে তোলেন। রাসেলের চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে খাঁটি খ্রিষ্টানের কিছুটা রেশ রয়ে গেছে তাই।’<sup>৭</sup>

রাসেলের ধর্মে অবিশ্বাস গোপন নয়। নিজের অবিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি আধুনিক নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষীদের মোক্ষম হাতিয়ারও। ধর্মে অবিশ্বাস তার আশৈশব প্রকৃতি হলেও তার চরিত্রে ধার্মিকতার দ্বাণ পাওয়া যায়। মূলত তার চরিত্রে খাঁটি খ্রিষ্টানের দ্বাণ খুঁজে পাওয়া ছফার বিশেষ কোনো আবিষ্কার নয়; বরং একটি সত্য সাক্ষ্য মাত্র।

মানুষ যে পুরোপুরি নির্মোহ হতে পারে না, এ সত্য খোদ রাসেলও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—

‘কোনো ব্যক্তি যখন সব ধরনের পারিপার্শ্বিক বাধা থেকে মুক্ত হয়, তখনই কেবল তাকে মুক্ত বলা চলে। তাহলে মুক্তচিন্তক কী থেকে মুক্ত হবে? নামটির যোগ্য হওয়ার জন্য তাকে দুটি বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে; আচার-অনুষ্ঠানের পিছুটান এবং নিজ আবেগের অত্যাচার। এ দুটি থেকে কেউ-ই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কিন্তু মানুষের আপাত দৃষ্টিতে সে মুক্তচিন্তক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।’<sup>৮</sup>

৬. আহমদ সফা, প্রবন্ধ সমগ্র, হাওলাদার প্রকাশনী, ৬৬ পৃ.

৭. প্রাপ্ত

৮. Bertand Russell, *The value of freethought*

এগুলো একেবারে গোড়ার কথা। মানুষ যদি সম্পূর্ণ নির্মোহ হওয়ার ইচ্ছা করে, সঠিক পদ্ধতিও অনুসরণ করে, তবুও এসব বিষয় তাকে প্রকৃত মুক্তচিন্তক হতে ব্যর্থ করে। মজার ব্যাপার হলো—কথিত মুক্তচিন্তকরা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। অক্সফোর্ড ডিকশনারির কথাই বলি, মুক্তচিন্তার সংজ্ঞায় লিখেছে—

‘A person who form their own ideas and opinions rather than accepting those of others people.’

অন্যের অভিমত গ্রহণ না করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করার স্লোগান শুনতে সুন্দর, কিন্তু এখানে লুকিয়ে আছে একটা সূক্ষ্ম কারচুপি। যদি প্রশ্ন করি— অন্যের মতামত নাহয় বাদ দিলাম, নিজের অভিমত প্রদান করা হবে কীভাবে?

ধর্মের কথা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের কথায় আসি। বিজ্ঞানের বইগুলোতে দেখা যায়, পদার্থের অনুগুলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউটন—এই তিনটি স্থায়ী কণা দিয়ে গঠিত। কোনো মুক্তচিন্তকের জন্য উচিত হবে না নির্দিধায় এসব তথ্য মেনে নেওয়া; তাকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। যাচাই করতে গেলে তার শুধু বই ঘাঁটলেই হবে না; নিজে থেকে পরীক্ষাও করতে হবে। আর পরীক্ষার জন্য তাকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। আর এই শিক্ষাও সত্য কি না, তা যাচাই করার জন্য আরও কয়েকটি শাস্ত্র ঘাঁটতে হবে। এভাবে শুধু একটি তথ্যকে মুক্তভাবে জানতে হলে তাকে হয়তো পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিতে হবে। এটা নিশ্চয় কেউ করে না, করবেও না। অথচ এই লোকগুলোই নিজেকে মুক্তচিন্তক দাবি করতে মোটেও পিছপা হয় না। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষ ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে নিজের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারে না। তাকে কিছু না কিছু বিশ্বাস করতেই হয়।

‘পূর্বসূরিদের জ্ঞানে বিশ্বাস না রাখলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়’—এই কথাটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। বস্তুত লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পরে সভ্যতা যে গতি পেয়েছে, এর পূর্বে তা কল্পনাও করা যেত না। লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানকে ধরে রাখতে শিখেছে, পৌঁছে দিতে পেরেছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অর্জন। পরবর্তী প্রজন্মকে আর শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি। পূর্বসূরিদের জ্ঞান যেখানে এসে থেমেছে, পরবর্তীরা সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করেছে। এভাবে একটার পর একটা প্রজন্ম এসেছে আর পূর্বসূরিদের জ্ঞানকে পুঁজি করে আরও সামনে এগিয়ে গেছে। আজকের যে বিজ্ঞানময় সভ্যতা, তা-ও সেদিনের গুহাবাসী মানুষের জ্ঞানের কাছে, তাদের অনুসন্ধানের কাছে ঋণী। আজকের বড়ো বড়ো গণিতবিদরা ঋণী সেই রাখালগুলোর কাছে, যারা প্রথম গুণে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল; পশুগুলো ঠিকঠাক ঘরে ফিরছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। প্রথম যে মানুষটা চাঁদ আর প্রেয়সীর মুখের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছিল, আকাশের চাঁদ আর প্রেয়সীর মুখকে অদ্ভুত এক সম্পর্কে একীভূত করে উচ্চারণ করেছিলেন ‘চাঁদমুখ’ শব্দটা, তার কাছে কি ঋণী নয় আজকের বড়ো বড়ো সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদরা?

মূলত এভাবেই জ্ঞান সৃষ্টি হয়, বিকশিত হয়; স্থানান্তরিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এই বিশ্বাসকে গোঁড়ামি বললে, এমন গোঁড়ামির প্রয়োজন আছে। অন্তত এতটুকু গোঁড়া না হলে জ্ঞানচর্চা করা সম্ভব নয়।

০৩

## মুক্তচিন্তা বনাম শুদ্ধচিন্তা

মানুষের চিন্তা বা জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। এর শুদ্ধতার ওপরই নির্ভর করে মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এজন্য চিন্তাকে নিঃসন্দেহে পরিশুদ্ধ রাখা দরকার। এতে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। বিতর্কের বিষয় হলো—চিন্তার শুদ্ধতার সঙ্গে ‘মুক্ত’ শব্দটির কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা নিয়ে। আমরা এ অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব।

গত কয়েক শতকে চিন্তা-বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার জন্য পাশ্চাত্যের গবেষকরা বিশদ লেখালিখি করেছেন। তাদের লেখনী থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু মতবাদ। এসব মতবাদের অন্যতম হলো মুক্তচিন্তা। মানব-মন চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি—সবকিছুর বাধাকে যেন উপেক্ষা করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখেই এ মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। এর নেপথ্যের কারণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

মধ্যযুগে ইউরোপে গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল খ্রিষ্টধর্ম এবং ধর্মপ্রাণিত সামাজিক সংস্কৃতি। জ্ঞানের শুদ্ধতার জন্য এ বাধাকে অতিক্রম করা আবশ্যিক ছিল। এজন্যই পাশ্চাত্যের গবেষকরা মুক্তচিন্তার ধারণা দেন; গবেষণার সকল পর্যায় থেকে ধর্মীয় প্রভাবকে নষ্ট করতে সচেষ্ট হন। পাশ্চাত্যের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক—চিন্তা মুক্ত হলেই কি শুদ্ধ হয়? শুদ্ধ চিন্তা মাত্রই কি ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত? ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস বা অমুক্তচিন্তা মাত্রই কি অশুদ্ধ? এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না পেলে মুক্তচিন্তার চরিত্র অধরাই থেকে যাবে।

শিশুদের মনে জগৎ সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন আসে। সেসব জানার দুটি পদ্ধতি আছে—মুক্ত ও অমুক্ত। সে নিজে চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর খুঁজে নেবে অথবা বড়ো কাউকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবে। প্রচলিত অর্থে প্রথম পদ্ধতিটি মুক্ত, দ্বিতীয়টি অমুক্ত। এখন দেখার বিষয়, শুদ্ধতার বিচারে কোনটি অগ্রগণ্য। আমরা প্রায় নিশ্চিত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের নিজের চিন্তা অসম্পূর্ণ বা বেঠিক হবে, আর বড়োদের থেকে জেনে নেওয়া তথ্য অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। অন্ধ ব্যক্তির জন্য কোনো পথ শনাক্তকরণের জন্য দুটি উপায় আছে—নিজে চেষ্টা করে পথ নির্ণয় করা অথবা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কাউকে জিজ্ঞাসা করা। অচেনা দেশে পথিকের দৃষ্টান্তও এখানে উল্লেখ করা যায়। তার কাছে কোনো ঠিকানা শনাক্তকরণের দুটি পদ্ধতি থাকে—নিজেই খুঁজে বের করা অথবা স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞাসা করা।

প্রতিনিয়তই আমরা এ ধরনের অসংখ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হই এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রথম পদ্ধতিকে গ্রহণ করি। এক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করি, তার উত্তরের প্রতি ভরসা করি। এভাবেই আমরা তথ্য অর্জন করি। আর এতে যে কোনো গোঁড়ামি বা অন্ধত্ব আছে, তা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, চিন্তায় কোনো বিশ্বাসের প্রভাব দেখা দিলেই তা অশুদ্ধ হয় না।

শিশুরা প্রথম যখন বিমান উড়তে দেখে, তখন একে বড়োজোর পাখিই মনে করতে পারে। কারণ, আকাশে চলন্ত একটা বিমান আকারে-আকৃতিতে কিংবা চলনে-বলনে পাখির মতোই। শিশুরা প্রতিনিয়ত পাখি দেখে অভ্যস্ত, তাই এর উর্ধ্ব চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং শিশুর জন্য বিমান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হলো কাউকে জিজ্ঞাসা করা। কাউকে জিজ্ঞেস না করে সে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, তা আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত বটে, কিন্তু সঠিক নয়।

আরেকটি উদাহরণ দিই—অন্ধের সামনে একটা বিকট আওয়াজ হলো। এমন শব্দ সে পূর্বে কখনো শোনেনি। পূর্বের শোনা কোনো আওয়াজের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক করতে পারছে না। কোনো প্রাণী, যন্ত্র কিংবা যানবহনের সাথেও এর কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না—তাহলে শব্দটি সে কীভাবে শনাক্ত করবে? তাকে অবশ্যই এমন কারও সাহায্য নিতে হবে, যে শব্দটি সম্পর্কে অবগত। জিজ্ঞাসা না করলে তাকে এ ব্যাপারে চিরদিন অজ্ঞই থাকতে হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, কথিত মুক্তচিন্তা সর্বদা সত্য জানার মাধ্যম নয়। মানুষের সীমাবদ্ধতার কারণে শুধু মুক্তচিন্তার ওপর নির্ভর করেই সব সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তা যত মুক্ত হবে, ভুল তত বেশি হবে।

অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনিকদের মতে—একজন শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার মন ‘ট্যাবুলাব্লাংকা’ বা একটা ফাঁকা স্লেটের মতো থাকে; তাতে কোনো দাগ থাকে না। একটা স্বচ্ছ পরিষ্কার মন নিয়ে তারা পৃথিবীর মাটিতে পা রাখে। শিশুর এই মুহূর্তের চিন্তা জীবনের অন্য যেকোনো মুহূর্তের চেয়ে বেশি মুক্ত। এই মুহূর্তেই সে সবচেয়ে বড়ো মুক্তচিন্তক। এ সময়ে তার কোনো আত্মপ্রবণতা নেই, সংস্কৃতির প্রভাব নেই, ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই কিংবা চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছুরও উপস্থিতি নেই। অথচ এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, শিশুর এই মুহূর্তের চিন্তাই সব থেকে ভুল চিন্তা। এই সময় সে খাবার ও পেশাব-পায়খানার মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে না।

কাজেই জ্ঞানের শুদ্ধাশুদ্ধির সাথে তা মুক্ত কি অমুক্ত, তার কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যকে জোর করে চাপিয়ে দিলেও তা সত্য, মিথ্যা মুক্তবুদ্ধি দিয়ে অর্জিত হলেও চিরদিন তা মিথ্যা।



ব্যবহারিক জীবনে আমাদের যত জ্ঞান, তার প্রায় সবই আমরা বিশ্বাস দিয়ে জেনেছি। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এই ঘূর্ণনের ফলে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে—এসব বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোও আমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জেনেছি; বিজ্ঞান আমাদের ঘরে ঘরে এসে এসব তথ্যের প্রমাণ পৌঁছে দেয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নকারীর চোখেও টেলিস্কোপ লাগিয়ে প্রমাণ করে দেখানো হয়নি। এর বিপরীতে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে আমরা যেসব জানতে পেরেছি, তা প্রকাশ করতেও লজ্জা হয়। শিশুমনের নিছক কল্পনা বলে সেসব লজ্জা নিবারণ করতে হয়।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তথাকথিত অমুক্ত পদ্ধতিকে (বিশ্বাস) বাদ দিয়ে শুধু ‘চিন্তার মুক্তি’ বলে চিৎকার শুরু করলে জ্ঞানের পরিধি মোটেও বাড়ানো সম্ভব নয়। বার্ট্রান্ড রাসেলের মুখেই শুনুন সে কথা—

‘বিজ্ঞান আমাদের বলে—আমরা কী কী জানতে পারি। কিন্তু আমরা যা জানতে পারি, তা খুবই অল্প। আমরা যদি ভুলে যাই যে আমরা অনেক কিছুই জানতে অক্ষম, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় সম্পর্কেই দিন দিন আমরা নির্বোধ হয়ে যাব।’<sup>৯</sup>

শিশুদের আমরা জ্ঞানহীন বলি, কিন্তু মহাবিশ্বের রহস্যের বিবেচনায় আমরা প্রত্যেকেই একেকজন শিশু।

এখন আসি ধর্মীয় জ্ঞান প্রসঙ্গে। স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল আদিম। মানব সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, পরকাল বলে কিছু আছে কি না—এসব প্রশ্ন মানুষের স্বভাবগত। কেউ হয়তো এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু মনে এসব প্রশ্নের উদ্রেক হয়নি—এমন মানুষ বিরল। মুক্তমনে বা কোনো ধর্মের আশ্রয় ছাড়া এর উত্তর খোঁজায়ও কোনো ত্রুটি করেনি মানুষ। এ ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে একটি পৃথক শাস্ত্রেরও জন্ম হয়েছে। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাও বটে। কিন্তু খেলিস থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, দীর্ঘ এ গবেষণার ফলাফল কী?

স্রষ্টা আছে কি নেই, পরকালের কর্মফল আছে কি নেই, মানব সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, আত্মা বা রূহের রহস্য কী? ইত্যাদি প্রশ্নের কি কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে দর্শন? ভবিষ্যতে কখনো দিতে পারবে বলে আদৌ বিশ্বাস করা যায়? কেন বিশ্বাস করা যায় না—এ বিষয়ে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যদি ধরে নিই ভবিষ্যতে দর্শন আমাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠবে—যতদিন না দর্শন এর উত্তর আবিষ্কার করছে, ততদিন কি মানুষ তার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা (তার জীবনের উদ্দেশ্য) সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে? ততদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে চলবে? যদি স্রষ্টা থাকে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যও থাকে, তাহলে মানব সৃষ্টির দুই লক্ষ বছরেও<sup>১০</sup> তা সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত হবে না?

<sup>৯</sup>. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge 1995, p.14

<sup>১০</sup>. <https://www.universetoday.com/38125/how-long-have-humans-been-on-earth/>

এই দীর্ঘ সময়ে আগত সকল মানুষ তাদের জন্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়েই জীবন শেষ করবে, তা হতে পারে না। জীবনের যদি কোনো অর্থ থাকে, কোনো উদ্দেশ্য থাকে (বিশেষ করে সে অর্থ যদি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রণীত হয়), তাহলে পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তির সামনেই তা স্পষ্ট হতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যেমন দার্শনিক ছিলেন না, তেমনি প্রথম দার্শনিকও এ সকল প্রশ্নের কোনো সুরাহা করতে পারেননি। এসব বাস্তবতা প্রমাণ করে, মুক্তচিন্তা দিয়ে এ সকল প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়।

বাকি থাকল ধর্মশাস্ত্র। ধর্মগুলো এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেয়। ধর্ম এই উত্তর কীভাবে দেয়, সেই প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। তবে এর উত্তর বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে—নিজে থেকে এ সব উত্তর পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দর্শন তার এত দিনের দীর্ঘ গবেষণা দিয়ে তা প্রমাণ করেছে। তাহলে মানুষ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবে কীভাবে?

এক্ষেত্রে অন্ধের উদাহরণকে উদ্ধৃত করা যায়। আগে শোনেনি, এমন কোনো শব্দের উৎস জানা অন্ধের পক্ষে সম্ভব নয়; যতক্ষণ না চক্ষুস্মান তাকে সাহায্য করে। এখন সবাই যদি অন্ধ হয়, তাহলে সমষ্টিগতভাবে কারও জানা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সব লোক অন্ধ হলে এ তথ্য চিরদিন অজানাই থাকবে; যদি না সে শব্দ নিজেই তার উৎস বলে দেয়। মানবসৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোও এমন। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল মানুষ অন্ধ। কেউ তা জানে না, জানার উপকরণও তাদের কাছে নেই। এসব বিষয়ে জানার একমাত্র উপায় হতে পারে—এমন কারও পক্ষ থেকে তথ্য সরবরাহ হওয়া, যিনি চাক্ষুস্মান বা এ বিষয়ে অবগত। অর্থাৎ এমন কোনো সত্তার পক্ষ থেকে সংবাদ আসতে হবে, যিনি পৃথিবীর কেউ নন; বরং পৃথিবী সৃষ্টি হতে দেখেছেন। কাজেই ধর্মবিষয়ক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে কেবল দুটি পথ খোলা—

ক. এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পৃথিবীর সব মানুষ অন্ধের মতো। জানার কোনো উপকরণ তাদের নেই।

খ. যদি জানা যায়, তাহলে তার একটি মাত্র উপায় হলো মানবজাতির বাইরে থেকে সে তথ্য আসতে হবে। কারণ, এ বিষয়ে মানবজাতি সামষ্টিকভাবে অন্ধের মতো। তাহলে সকল বিতর্ক হতে হবে বাইরে থেকে তথ্য পাওয়ার সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে। তা সম্ভব কি না, সম্ভব হলে তার পদ্ধতি কী, সে সংবাদ কার কাছে আসবে—এসব প্রশ্ন নিয়ে তখন আলোচনা হবে। এক্ষেত্রে ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটিও অপ্রাসঙ্গিক।

মোটকথা ধর্ম যেসব তথ্য দেয়, তা মুক্তচিন্তা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই অনিবার্যভাবে হয় এসব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে নিরাশ হতে হবে, নয়তো ওহি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভরসা করতে হবে। ব্যক্তিগত জ্ঞান-গবেষণা দিয়ে এ সকল তথ্য জানা সম্ভব নয়। কারণ, মুক্তচিন্তা কেবল সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে মানুষের জানার সামর্থ্য আছে। আর যা জানার সামর্থ্য নেই, সেখানে মুক্তচিন্তার দাবি করাই অনর্থক।



## মুক্তচিন্তা ও ধর্মহীনতা

‘মুক্তচিন্তা ও ধর্মহীনতা’র পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি দিক আছে : একটি ঐতিহাসিক, অন্যটি তত্ত্বীয়। ঐতিহাসিক সম্পর্কের দিকটি প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে মুক্তচিন্তা শব্দটি ধর্মবিদ্বেষের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়েছে, সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা মুক্তচিন্তা ও ধর্মহীনতার সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিকটি আলোচনা করব। ধর্মহীনতার সাথে তাত্ত্বিকভাবে মুক্তচিন্তার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, মুক্তচিন্তা নিশ্চিতভাবে ধর্মহীনতার দিকেই ধাবিত হয় কি না, স্রষ্টায় বিশ্বাস মাত্রই তা মুক্তচিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজব এ অধ্যায়ে।

যারা ধর্মে অবিশ্বাস করে, তাদের যুক্তিগুলোর সারমর্ম মোটামুটি তিনটি—

ক. ধর্মবিষয়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা অপ্রয়োজনীয়।

খ. এসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজনীয় হলেও নিশ্চিতভাবে তা জানা অসম্ভব।

গ. স্রষ্টার কোনো অস্তিত্বই নেই।

এসব যুক্তির ভিত্তিতে যে মতবাদগুলো আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলোকেও মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে একত্রিত করা যায়—

ক. অজ্ঞেয়বাদ : এ মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বকে এবং তার স্রষ্টাকে জানা অসম্ভব। কাজেই স্রষ্টা সম্পর্কে এদের কোনো মন্তব্য নেই। এদের মতে—স্রষ্টা অপ্রমাণযোগ্য, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করাও সম্ভব নয়।

খ. নাস্তিকতা : এ মতবাদে বিশ্বাসীরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই; কাজেই ধর্মেরও কোনো ভিত্তি নেই।

গ. ঈশ্বরবাদ : এ মতবাদে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর তিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। বিশ্ব তার আপন গতিতে চলছে; এতে তাঁর কোনো হস্তক্ষেপ নেই, সৃষ্টি থেকে তাঁর কোনো চাওয়া নেই।

আমরা অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে আলোচনা শুরু করব। এর পর নাস্তিকতা ও ঈশ্বরবাদ দিয়ে আলোচনার ইতি টানব। এ আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করব, ধর্মহীনতার সাথে মুক্তচিন্তার কোনো যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক আছে কি না।

## অজ্ঞেয়বাদ

সাধারণভাবে অজ্ঞেয়বাদ বলতে বোঝায়—জ্ঞানের দ্বারা জগৎকে জানার অক্ষমতা। অজ্ঞেয়বাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Agnosticism-এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায় উনবিংশ শতকের ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলির (Thomas Henry Huxley) রচনায়। ধর্ম দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে জানা সম্ভব কি না, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মূলত অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু যে যুক্তির ওপর এর ভিত্তি, তা কেবল স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অজ্ঞেয় করে তোলে না; বরং জগতের সব জ্ঞানকেই অজ্ঞেয় বলে সাব্যস্ত করে। দর্শনকোষ প্রণেতা লিখেছেন—

‘আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ পরিণামে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। অজ্ঞেয়বাদীদের মতে, কেবল বিশ্ব বিধাতাই যে অজ্ঞেয় তা নয়; বরং প্রাকৃতিক বিধান, সমাজের বিকাশ ধারা—সবই অজ্ঞেয়। তাই তাদের মতে—বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞান আমাদের দিতে পারে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।’<sup>১১</sup>

অজ্ঞেয়বাদ মানব-জ্ঞানের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করে। কাজেই এ মতবাদ অনুসারে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও অবিশ্বাস্য। মানুষ পৃথিবীর বুকে এতদিন যা কিছু জানে বলে ধরে নিয়েছে, তার সবকিছুকেই অজ্ঞেয়বাদ নাকচ করে। এতে কেবল স্রষ্টার অস্তিত্বই অজ্ঞেয় হয় না; নিজের অস্তিত্বও একপর্যায়ে অজ্ঞেয় হয়ে যায়। আরও বড়ো কথা হলো—এ তত্ত্ব অনুসারে কোনো তত্ত্ব প্রয়োগেরও সুযোগ নেই। কারণ, তত্ত্ব প্রয়োগের জন্য কিছু না কিছু জানতে হয়। ফলে অজ্ঞেয়বাদ একটি আত্মঘাতী তত্ত্ব। মার্কিন লেখক ও চক্ষুবিশেষজ্ঞ লরেন্স ব্রাউন (Laurence B. Brown) একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—

‘তোমরা দাবি করলে—কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। তাহলে এ ব্যাপারে তোমরা এত নিশ্চিত হলে কীভাবে?’<sup>১২</sup>

আত্মঘাতী হওয়ার কারণে অজ্ঞেয়বাদ নানা মতবাদ দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ যেমন এর সমালোচনা করেছেন, তেমনি নাস্তিক পণ্ডিতগণও এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো—এ মতবাদ নিজেই প্রমাণ করে, এটি সত্য নয়। কারণ, কোনো প্রশ্নের উত্তর কখনো ‘জানি না’ অথবা ‘জানা সম্ভব নয়’ হতে পারে না; বরং এটি উত্তর প্রদানের অক্ষমতা বোঝায়। আর উত্তর প্রদানে অক্ষমতা কখনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না।

<sup>১১</sup>. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ২৮ পৃ.

<sup>১২</sup>. Laurence B. Brown (2007). *Religion of Islam: Agnosticism* Retrieved May 25, 2008.

বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায়ও এ মত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Friedrich Engels) তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Anti-Dühring*-এ অজ্ঞেয়বাদকে সমূলে খণ্ডন করেছেন। তার মতে, মানুষ আদৌ জানতে পারে কি না—এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মাথা ঘামানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। কারণ, মানুষ বস্তুকে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই জানছে না; বরং বাস্তবে সে বস্তুকে স্পর্শ করছে, বিশ্লেষণ করছে, তার অন্তর্নিহিত বিধিবিধানকে জানছে এবং জ্ঞাত সেই বিধানকে প্রয়োগ করে বস্তুকে নতুনভাবে গঠনও করছে।<sup>১৩</sup> কাজেই অজ্ঞেয়বাদের যে কোনো ভিত্তি নেই, এই বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করার কিছু নেই; বরং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তা ছাড়া স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে ধর্ম যে ধরনের প্রমাণ পেশ করে, তাকে অজ্ঞেয়বাদ অস্বীকার করতে পারে না। ধর্ম স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে ওহির ধারণা নিয়ে আসে। ওহি মানবরচিত নয়, মানবজ্ঞান নির্ভরও নয়; বরং প্রত্যাদেশ। কাজেই তাত্ত্বিকভাবে অজ্ঞেয়বাদীদের ওহিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মৌলিক কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

## নাস্তিকতা

ধর্মহীনদের দ্বিতীয় মতবাদ হলো—নাস্তিকতা (Atheism)। বৃহত্তর দৃষ্টিতে নাস্তিকতা বলতে বোঝায়, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় (Deities) অবিশ্বাস।<sup>১৪</sup> একটু সংকীর্ণ অর্থে নাস্তিকতা হলো—সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত সত্তাকেই অস্বীকার করা।<sup>১৫</sup>

এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে নিজের বিশ্বাস জাহির করা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সংজ্ঞা দুটি নিছক তত্ত্ব নয়; বরং নাস্তিকদের দুটি দলের মুখপাত্রও বটে।

দ্বিতীয় দলের মত দিয়ে আমরা শুরু করব। তাদের মতে, অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তাই নেই। অর্থাৎ এটা কোনো বিশ্বাস নয়; বরং একটি ঘোষণা। কিন্তু এই ঘোষণা দেওয়ার অধিকার কারও আছে কি? অধিকার যদি নিছক বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। মন যার আছে, বিশ্বাস করার অধিকারও তার আছে; যেকোনো কিছুই সে বিশ্বাস করতে পারে। এ অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না; চাই সে বিশ্বাস যত অদ্ভুতই হোক না কেন। কেউ যদি নিজেকে উদ্ভিদ বা গরু-ছাগল বলে বিশ্বাস করে, তাতেই-বা কী বলার আছে! কিন্তু সে যখন নিছক বিশ্বাসের পরিবর্তে একে তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তখন অবশ্যই আপত্তি উঠবে। একইভাবে নাস্তিকরা

<sup>১৩</sup>. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, ২৯ পৃ.

<sup>১৪</sup>. Harvey, Van A., *Agnosticism and Atheism*, in Flynn 2007, p. 35

<sup>১৫</sup>. প্রাপ্ত

যখন ঘোষণা দেয়—‘অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তাই নেই’, তখন এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা একে তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের এই তত্ত্বের দাবি হলো—সৃষ্টির কোনো স্রষ্টা নেই, এ কথা বলার অধিকার কি কারও আছে?

একটু বিশ্লেষণ করা যাক। কোনো বস্তু বা ব্যক্তি নেই—এ কথার অর্থ কী? ধরা যাক কেউ বলল—‘এই ঘরে কোনো এলিয়েন বা মহাজাগতিক প্রাণী নেই।’ এ কথা বলার অধিকার অর্জন করতে হলে তাকে ঘরটি সম্পর্কে জানতে হবে অথবা চোখ দিয়ে দেখতে হবে। এ কথাটুকু বলা খুব সহজ এবং এ কথা বলার অধিকার অর্জন করাও সহজ। কারণ, ছোটো একটা ঘরে চোখ বোলানো বা এর সম্পর্কে জানাটা খুব কঠিন নয়। কিন্তু এই বাক্যটি থেকে যদি ঘর শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ কী দাঁড়াবে মহাবিশ্বেই কোনো এলিয়েন নেই।

আমরা কেউ কখনো এলিয়েন দেখিনি—এর শুধু সংজ্ঞা শুনেছি। এটি একটি মহাজাগতিক প্রাণী বা সত্তাবিশেষ। এখন কিছুসংখ্যক মানুষ যদি দাবি করে, তারা গতকাল একটি এলিয়েন দেখেছে; আকাশ থেকে একটি প্রাণী নেমে এসে পৃথিবীতে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে চলে গেছে, তাহলে এই কথাকে মিথ্যা বা ভুল বলার অধিকার কারও আছে কি?

এই তথ্যকে ভুল প্রমাণ করা সাধ্য কারও আছে কি না, এমন প্রশ্নে কেউ কেউ হয়তো বিজ্ঞানকে সামনে আনতে চাইবে। কেউ হয়তো বলে বসবে, স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়ে দেখা যাবে। এসব কথা হাস্যকর। কারণ, তাদের যে গঠন, তা স্যাটেলাইটের ক্যামেরার ফ্রিকোয়েন্সিতে ধরা সম্ভব না-ও হতে পারে। কেউ কেউ যুক্তি দেবে, তাহলে মানুষ দেখল কীভাবে? মানুষের চোখ যদি ধরা পড়ে, তাহলে ক্যামেরায় ধরা পড়বে না কেন? এ প্রশ্নও ধোপে টিকবে না। কারণ, হতে পারে যে তারা নিজেদের গঠন পরিবর্তন করতে পারে, তাদের শরীরের রঙের ফ্রিকোয়েন্সিও পরিবর্তন করতে পারে—এভাবে যত যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, ওই লোকগুলোর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোনো অধিকার নেই কারও।

একটি প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে—যে দেখার দাবি করেছে, প্রমাণের দায়িত্বও তার। এই কথাটি খুবই হাস্যকর। নিস্তরু ফাঁকা রাস্তায় আমার মালামাল ডাকাতি হলো। পৃথিবীর আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না, ডাকাতদের আমি চিনতেও পারিনি। মোটকথা, এ ঘটনার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। এখন আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই বলেই কি ডাকাতির ঘটনা মিথ্যা? আরেকটি বিষয় হলো—বাড়তি দুই-চারজন লোকের সাক্ষ্য যদি ডাকাতির ঘটনার প্রমাণ হতে পারে, তাহলে পুরো গ্রামের দেখা কি এলিয়েন দেখার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না?

০৫

## জ্ঞানচর্চায় ইউরোপের ঐতিহাসিক ভ্রম

মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের পর ক্ষমতার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ইউরোপের প্রাধান্য ছড়িয়ে পরে। বিজিতের আদর্শে বিজয়ীর প্রভাব পড়ে, ইতিহাসে বহুবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যখন থেকে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়াভিযান শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বিজিত অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জীবন-দর্শনে তাদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে পড়ায় পৃথিবীর একটা বৃহৎ অঞ্চল ইউরোপের শেকলবন্দি হয়ে যায়। ব্রিটিশ আধিপত্য চলে কয়েক শতাব্দী ধরে। এই সময়ে তাদের জ্ঞান-গবেষণা, আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছু ছড়িয়ে পড়ে বিজিত ভূখণ্ডে।

তাদের ছিল উন্নত জীবনোপকরণ। পার্থিব জীবন নিয়ে তারা যে পরিমাণ গবেষণা করেছে, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির মধ্যে এমন নজির মেলা ভার। পার্থিব সুখ ও আনন্দের যাবতীয় উপকরণ তাদের গবেষণায় ধরা পড়েছিল। শিল্প-সাহিত্যেও তাদের অগ্রগতি ছিল চোখ ধাঁধানো। এগুলো সবই মানুষের সহজাত আকর্ষণের উপলক্ষ্য।

একদিকে সামরিক ক্ষমতা, অপরদিকে লোভনীয় জীবনোপকরণ সহজেই বিজিত অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলে। বুদ্ধিবৃত্তিতে অগ্রসর অনেক জাতিও তাদের অন্ধ অনুকরণে ধন্য হয়। পশ্চিমা পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও চাল-চলনের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হওয়াকে তারা গৌরব ও অহংকারের বিষয় মনে করতে শুরু করে।

বহু সাধনা ও ত্যাগের পরে পশ্চিমের শাসন শেষ হয়। ব্রিটেনের শাসনের লাঠি উঠে যায় মাথার ওপর থেকে। তবে ঔপনিবেশের অবসান হলেও মানসিক দাসত্বের অবসান হয়নি; বরং বেড়েছে সময়ের সাথে পালা দিয়ে। ব্রিটিশরা চলে গেছে, কিন্তু রেখে গেছে তাদের দর্শন। সে দর্শনে লালিত-পালিত বুদ্ধিজীবীরা যেন তাদেরই অবৈধ সন্তান। মজার ব্যাপার হলো—সন্তান পিতার দর্শনে আপাদমস্তক ডুবে গেলেও পিতা তার অবৈধ সন্তানদের স্বীকারও করে না।

যেকোনো বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য মেনে নেওয়ার হীনম্মন্যতা একটি মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্যবাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক ঔপনিবেশ থেকে প্রাচ্যের অধিকাংশ পণ্ডিত-ই মুক্ত নয়। ইউরোপের নাস্তিকতা ও ধর্মবিদ্বেষ এ দেশে সংক্রমিত হয়েছে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ঔপনিবেশের সূত্র ধরেই।

সন্দেহ নেই, নাস্তিকতা বহু পুরোনো মতবাদ। প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় সব অঞ্চলে এর কম-বেশি অস্তিত্ব ছিল। তবে আধুনিক নাস্তিকতা পশ্চিমাদেরই অন্ধ অনুকরণ। বুদ্ধিবৃত্তিতে কারও অন্ধ অনুকরণ একটি বিরাট ভ্রান্তি। প্রাচ্যের অনেক বড়ো পণ্ডিতও এ থেকে পরিত্রাণ পায়নি।

মোটকথা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বুদ্ধিবৃত্তিতে নয়া গোলামি তৈরি করেছে। ফলে সবকিছুকেই ইউরোপের চোখ দিয়ে দেখার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তাই আধুনিক মতবাদগুলো পরখ করতে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে যাচাই করা আবশ্যিক। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তিগুলো সনাক্ত করা জরুরি। ইউরোপের গবেষণায় কোন কোন উপাদানের ঘাটতি ছিল, তা আলোচনায় না এলে মুক্তচিন্তার মতো একটা খাঁটি পাশ্চাত্য ধারণার আদ্যোপান্ত বোঝা সম্ভব নয়।

এখানে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের লক্ষণীয় ঘটতিগুলো আলোচনা করছি। এতে বোঝা যাবে, ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা কতটুকু নির্ভুল ছিল।

### গ্রিক সভ্যতার সর্বাঙ্গিক অনুকরণ

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাম্প্রতিক বলে দৃষ্টিভ্রম হতে পারে। মূলত এটা একটা প্রাচীন সভ্যতার নবজাগরণ মাত্র। এজন্যই পাশ্চাত্যের উত্থানকে রেনেসাঁস (Renaissance) বলা হয়। এখানে জাগরণ মানে গ্রিক সভ্যতার জাগরণ। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা স্বভাবে-প্রভাবে গ্রিক সভ্যতারই উত্তরসূরি। পাশ্চাত্যের গবেষকমহলও এ কথা অস্বীকার করে না।

এবার প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার স্বভাব-প্রকৃতি কেমন ছিল, তা একটু দেখা যাক। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা ছিল একটা বস্তুবাদী সভ্যতা, সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই সবকিছু বলে গণ্য হতো। মানুষের ইচ্ছা, আবেগ ও চাওয়ার সর্বোচ্চ পূরণই এ সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল। পিথাগোরাসের একটা মন্তব্যে পুরো সভ্যতার মূলমন্ত্র ফুটে উঠেছে—‘Man is the measure of all things.’

মানুষ যখন মানদণ্ড, তখন মানুষের সুখই মুখ্য হয়ে উঠেছিল এ সভ্যতায়। তাই তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে জীবনকে উপভোগ করার তীব্র বাসনা খুঁজে পাওয়া যায়।

নৈতিকতার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিলেও ধর্ম তাদের প্রবৃত্তিচর্চার বাড়তি একটা উপকরণে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ ও নাচ-গানই ছিল ধর্মাচারের মূল উপাদান। অনেক পাশ্চাত্য গবেষক এ সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ উইলিয়াম লেকি

(William Edward Hartpole Lecky) মন্তব্য করেছেন, গ্রিক চেতনা ছিল নিছক বুদ্ধি ও মস্তিষ্কনির্ভর, পক্ষান্তরে মিশরীয় চেতনা ছিল সম্পূর্ণ আত্মিক।<sup>১৬</sup> তিনি গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (Epicurus)-কে উদ্ধৃত করেন—‘মিশরীয় দেবতারা তুষ্ট হয় কান্নাকাটিতে, আর গ্রিক দেবতারা প্রসন্ন হয় নৃত্যে।’<sup>১৭</sup>

এপিকিউরাস নিজেও এই নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতাদর্শকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন গ্রিসে এপিকিউরীয় (Epicurean) দর্শন জন্মলাভ করে। তিনি বলতেন—‘Pleasure is the principle and end to a happy life.’

উইলিয়াম লেকি তাঁর গ্রন্থে যে বক্তব্য পেশ করেন, তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যথেষ্ট যে, গ্রিক সভ্যতায় যে মাত্রায় বস্তুবাদী চেতনা বিকশিত হয়েছিল, তা বোধ হয় আর কোনো সভ্যতায় হয়নি। তিনি বলেন—

‘কোনো সন্দেহ নেই, এই উক্তির শেষাংশের (গ্রিক দেবতারা প্রসন্ন হয় নৃত্যে) সত্যতা গ্রিসের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। বস্তুত কোনো ধর্মের প্রথা ও আচারানুষ্ঠানে আনন্দ-উৎসব, ক্রিয়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার এতটা মিশ্রণ পাওয়া যায় না, যতটা পাওয়া যায় এখানে। এদের ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে কেবল এতটুকু ধারণা পাওয়া যায়, যতটুকু ধারণা মানুষ কোনো ধর্মগুরু সম্পর্কে পোষণ করে। এর বেশি কিছু না। স্রষ্টাকে কিছু প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান সহকারে স্মরণ করা তাদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল।’<sup>১৮</sup>

সায়িদ্ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. গ্রিকদের জীবনাচার বিশ্লেষণ করে তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে এনেছেন। তিনি লিখেছেন—

‘গ্রিক সভ্যতার মূল যে বৈশিষ্ট্য তাকে অন্য সভ্যতা থেকে পৃথক করেছে, তা হলো—

ক. যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস, আর যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত, তাতে অবিশ্বাস।

খ. ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি ও পার্থক্য ভোগ-বিলাসে আসক্তি।

গ. উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা।’<sup>১৯</sup>

মোটকথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও পার্থিব জীবনই ছিল গ্রিকদের ধর্ম। এই একটি ধর্মেই তারা ছিল বিশ্বাসী। এই ধর্মকে পরাস্ত করে অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস তাদের মনে প্রবেশ করতে পারেনি। বস্তুবাদ তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। এভাবেই তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায় বস্তুবাদের বীজ বহন করেছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিয়েছে বস্তুবাদের বীজ।

<sup>১৬</sup>. W.E.H. Lecky, *History of European Morals*, London 1869, v.1, p.344-3345

<sup>১৭</sup>. প্রাগুক্ত

<sup>১৮</sup>. প্রাগুক্ত

<sup>১৯</sup>. আবুল হাসান আলি নদভি (রহ), *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?* ২৮৯ পৃ.

খ্রিষ্টবাদের প্রভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গি কিছুদিন ঢাকা পড়েছিল। ক্রমশ বৈরাগ্যের দিকে ছুটছিল খ্রিষ্টবাদ। একপর্যায়ে খ্রিষ্টবাদের ওসিলায় ইউরোপে নজিরবিহীন বৈরাগ্য এসে ভর করে। কঠিন বৈরাগ্যে বিতৃষ্ণ ইউরোপ যখন পার্থিব জীবনে মনোযোগী হলো, তখন তারা পূর্বপুরুষদের চেতনার দিকেই ফিরে গেল। এজন্য রেনেসাঁসের সময়ে ব্যাপকভাবে গ্রিক দর্শন ও গ্রিকদের চিন্তাধারাকে আলোচনায় আনা হয়। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিতে যে নৈতিকতা ও ধর্মহীনতার সংকট দেখা দিয়েছে, তার বীজ এই গ্রিক জীবনাচারের মধ্যে প্রোথিত ছিল।

এরপরে ইউরোপ যেখানেই হাত দিয়েছে, কেবল বস্তুবাদেরই আবাদ করেছে। ইউরোপের ঘরে যে ফসলই উঠেছে—সে বিজ্ঞানেরই হোক, আর দর্শনেরই হোক, তা বস্তুবাদের আবরণেই আপাদমস্তক জড়ানো। বস্তুবাদের সাথে সাংঘর্ষিক— এমন কোনো ব্যাখ্যাই তারা গ্রহণ করেনি। একইভাবে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই লুফে নিয়েছে; আগপাছ বিবেচনার প্রয়োজন মনে করেনি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

আধুনিক ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণাসহ বহু বিষয়ে গ্রিক সভ্যতার সাথে দ্বিমত করেছে, কিন্তু বস্তুবাদের প্রশ্নে গ্রিকদের থেকে এতটুকুও সরে আসেনি; বরং তাদের চেতনাকেই ধারণ করেছে। এই বস্তুবাদই ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রধান সংকট তৈরি করেছে।

## অস্থির মনোবৃত্তি

ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও শিল্পোন্নতি কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল না; বরং একটা নৈরাজ্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে রুখে দাঁড়ানো জনগোষ্ঠীর অস্থির আন্দোলনের ফল ছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের হঠাৎ জ্বলে উঠার পেছনে খ্রিষ্টধর্মের দীর্ঘ নির্যাতন ও গোঁড়ামি পুরোপুরি দায়ী ছিল। কাজেই ইউরোপের পুরো জাগরণকে যদি বৃহৎ অর্থে খ্রিষ্টধর্মবিরোধী বিপ্লব বলা হয়, তাহলে ভুল হবে না। কারণ, আজকের ইউরোপের যা কিছু চিন্তাধারা, খ্রিষ্টবাদ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তির মূল অনুসন্ধান করতে ওইসব নির্যাতনেরও একটা চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

খ্রিষ্টধর্ম বৈরাগ্যবাদের চরম উৎকর্ষ দিয়ে ইউরোপকে তার স্বভাবের পুরো বিপরীত দিকে আহ্বান করছিল। আমরা আগেই বলেছি, ইউরোপ পুরোমাত্রায় নান্দনিক জীবনাচার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিল। এটি ছিল তাদের পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য। অথচ সেখানে খ্রিষ্টবাদ চরম বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হচ্ছিল। মার্কিন বিজ্ঞানী জন উইলিয়াম ড্রাপার (John William Draper) তাঁর *History of the Conflict Between Religion and Science* গ্রন্থে বৈরাগ্যবাদের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন।

সেন্ট জেরুমের (Saint Jerome) আমলে স্টার উৎসবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটত। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে একজন নেতৃস্থানীয় সাধুর অধীনে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী ছিল, আর সাধু সেরাপিয়নের (Saint Serapion) অধীনে ছিল দশ হাজার। চতুর্থ শতকের শেষের দিকে সন্ন্যাসীদের এ সংখ্যা মিশরের মোট জনসংখ্যাকেও প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল।



০৬

## মানব অনুসন্ধানের ব্যর্থতা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

আত্মপরিচয় সন্ধান করা মানুষের প্রাচীন অভ্যাস। মানুষ প্রাচীন গুহাবাসীই হোক আর চন্দ্রবিজয়ীই হোক, আত্মপরিচয় জানার ইচ্ছা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। আজকের উন্নত জীবনোপকরণে সমৃদ্ধ মানুষ আর সেদিনের অন্যচারী গুহাবাসী মানুষ; আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, উভয়ই বরাবর। এর মূলে রয়েছে মানুষের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য—যা তাকে পুরো প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা করেছে। এই স্বতন্ত্রতা ঠিক কীসে, তার ব্যাখ্যা দিতে দার্শনিক মহলে নানা মত সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানুষ যে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা, সে ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

প্রাণিজগতের অন্যদের সাথে মানুষের পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

‘নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। ওপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে অদৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।

একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়; সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত, তাহলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। ...পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হলো তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি মানুষের হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যস্ততায় সে কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়—অনেকটাই অনাবশ্যক।’<sup>২০</sup>

<sup>২০</sup>. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, মণ্ডলা ব্রাদার্স, ১৩ পৃ.

মানুষের যে আত্মপরিচয় জানার ইচ্ছা, তা মানুষের সত্তাগত, স্বভাবগত। এ স্বভাব সব কালেই মানুষকে তাড়া করেছে। ফলে মানুষ জন্ম দিয়েছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার। মানুষের প্রায় সকল প্রশ্নই কালের আবর্তনে কোনো একটি নতুন শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে অথবা যুক্ত হয়েছে কোনো শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ে। দেখার বিষয় হলো—মানুষ তার অস্তিত্বের সন্ধান খুঁজতে কোন শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে? অথবা অন্য কোনো শাস্ত্রে মাথা গুঁজেছে কি না?

এর উত্তরে দুটি বিশেষ শাস্ত্র আমাদের সামনে উঠে আসে ধর্ম ও দর্শন। দুটোর জিজ্ঞাসা অভিন্ন হলেও পথ ভিন্ন। দর্শন ও ধর্ম দুটিই চায় পরম সত্তার সন্ধান লাভ করতে। প্রশান্তি পেতে এবং একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে মানবকল্যাণে ব্রত হতে।<sup>২১</sup> কিন্তু দুটির চিন্তার পদ্ধতিগত বিভিন্নতার কারণে দুটি আলাদা শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং পারস্পরিক বিরোধকে টিকিয়ে রেখেছে যুগযুগ ধরে।

দর্শনের মূল বাহন যুক্তি ও বিচার, কিন্তু ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হলো বিশ্বাস ও ভক্তি। দর্শনে পরম সত্তাকে দেখা হয় বৌদ্ধিক চিন্তার উপজীব্য ও বিচার্য হিসেবে। কিন্তু ধর্মে সেই সত্তাকে গণ্য করা হয় অবিচল বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উপভোগের ব্যাপার হিসেবে।<sup>২২</sup>

ওপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় পাওয়া গেল। কালের পরিক্রমায় মানুষ তার অস্তিত্বের সন্ধানে দুটি শাস্ত্রের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে ধর্ম হলো বিশ্বাস বা ওহিনির্ভর। অন্যদিকে দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ-পদ্ধতি।

দুটি শাস্ত্র যখন একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তখন এদের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। ধর্ম মানুষকে তার জিজ্ঞাসার জবাব কতটুকু দিয়েছে, দর্শনই-বা কতটুকু উত্তর খুঁজতে পেরেছে—তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন আরও তীব্র অনুভূত হয়, যখন দুটি শাস্ত্রেরই বয়স কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে গেছে।

এই দুইয়ের সাথে বিজ্ঞানকে নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করাটা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। কারণ, বিজ্ঞান মানুষকে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই প্রদান করবে, এমন একটি অন্ধ মনোবৃত্তি আমাদের সমাজে লক্ষ করা যাচ্ছে। কাজেই ব্যক্তির আত্মসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলা যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়েও কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব এ অধ্যায়ে।

## বিজ্ঞানের নীরবতা

জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে আধুনিক মানস যে কয়টি মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হলো বিজ্ঞান। কোনো কিছু শনাক্ত করার জন্য অথবা জ্ঞানগত কোনো বিতর্কের সমাধানে

<sup>২১</sup>. ড. আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, ৪৯ পৃ.

<sup>২২</sup>. প্রাগুক্ত

পৌছার জন্য বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে। একে মানুষ সংগতও মনে করে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ অবলীলায় ধর্মকেন্দ্রিক বিতর্কের সমাধানের ভার তুলে দিতে চায় বিজ্ঞানের হাতে। বিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কার ও নব উদ্ভাবিত তত্ত্বের দোহাই দেখিয়ে কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্তে পৌছাতে চায় যে, স্রষ্টায় বিশ্বাসের দিন অতীত হয়েছে। যেমন : ব্রিটিশ বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী জুলিয়ান হ্যাক্সলে (Julian Sorell Huxley) লিখেছেন—

‘বিজ্ঞানী নিউটন দেখিয়েছেন, ঈশ্বর গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন না। ল্যাপলেস তার বিখ্যাত সূত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন, জ্যোতির্বিদ্যায় ঈশ্বরের ধারণা প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। জীববিজ্ঞানে ডারউইন ও পাস্তুর একই বিষয় প্রমাণ করেছেন। আমাদের শতকেও বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের উত্থান ও ঐতিহাসিক তথ্য স্রষ্টার ধারণাকে এমন একটি স্থানে নিক্ষেপ করেছে, যেখান থেকে স্রষ্টাকে আর মানব আচরণের ব্যাখ্যায়—ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণে কিংবা মানবীয় বিষয়ের হস্তক্ষেপকারী বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়।’<sup>২৩</sup>

একই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যায় অন্য একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীর কাছে—

‘বিজ্ঞান ধর্মকে ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও জঘন্যতম প্রতারণা হিসেবে প্রমাণ করেছে।’<sup>২৪</sup>

এ থেকে বোঝা যায়, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম যাচাইয়ের মানসিকতা কেবল গণমূর্খের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং কিছু জ্ঞানীমূর্খও একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। ইতঃপূর্বে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে এসেছি। সেখানে আমরা দেখেছি—বিজ্ঞান কী, কেন এবং কীভাবে কাজ করে। বিজ্ঞান যে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারে না, তা আমরা সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি—বিজ্ঞান যেসব তথ্য প্রদান করে, সেগুলোর ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার সাথে এখানে আরও কিছু তথ্য যোগ করছি।

অধ্যাপক হ্যাক্সলে ও তার সঙ্গীরা যে যুক্তি দিয়েছেন, তা থেকে শুরু করা যাক। তাদের বক্তব্য হলো—প্রাকৃতিক সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, কাজেই আমাদের অচেনা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করার আর কোনো অর্থ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর গতি এবং বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জেনে গেছি। কাজেই কোনো অজানা সত্তা এসব বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে—এ ধারণার আর কোনো সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এ কথার খুব সুন্দর জবাব দিয়েছেন একজন খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিক; ‘Nature is a Fact, not an Explanation.’<sup>২৫</sup>

<sup>২৩</sup>. *Religion without revelation*, New York 1958, p.58

<sup>২৪</sup>. C.A. Coulson, *Science and Christian Belief*, p.4

<sup>২৫</sup>. Maulana Wahiduddin Khan, *God Arises*, p.26

এ কথা সত্য, বিজ্ঞান প্রকৃতির বহু রহস্য উন্মোচন করেছে, বহু প্রাকৃতিক সূত্র আবিষ্কার করেছে। কিন্তু স্রষ্টার ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছে অথবা ধর্মের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এ কথার ভিত্তি কতটুকু?

আধুনিক বিজ্ঞান তার যাবতীয় অনুসন্ধান দ্বারা কেবল আমাদের দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করতে পারে, ঠিক একটা চশমা মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে যেমন বর্ধিত করে। দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনার মৌলিক কারণ কি ব্যাখ্যা করতে পারে? বিজ্ঞান আমাদের হয়তো ‘কী’-এর উত্তর দিতে পারে, কিন্তু ‘কেন’-এর উত্তর কি দিতে পারে?

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে একটি মুরগির বাচ্চার উদাহরণ দেওয়া যাক। এটি পৃথিবীতে কীভাবে এলো? একটা মুরগির ড্রুগ ডিমের খোসার মধ্যে ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে এবং যখন শক্ত খোসাটি ভেঙে যায়, তখন সে বাইরে বেরিয়ে আসে। এখন প্রশ্ন হলো—কীভাবে একটি ডিমের খোসা একদম সঠিক সময়ে ভেঙে গেল, আর ভেতরের অঙ্গানু—যা এক টুকরো মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই না, তা কীভাবে বাইরের পৃথিবীতে আসার রাস্তা করে নিল? অতীতে কোনো ধার্মিক ব্যক্তি হয়তো স্পষ্ট উত্তর দিতেন, ‘স্রষ্টার হাত আছে এখানে।’ কিন্তু এখন আণুবীক্ষণিক গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে যে, ঠিক একুশতম দিনে মুরগির বাচ্চাটি যখন বেরিয়ে আসার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়, তখন তার একটি ছোট শিং বা দাঁত<sup>২৬</sup> (Egg Tooth) গজায়, যার মাধ্যমে সে শক্ত আবরণ ভেদ করে বাইরে চলে আসে। কাজ শেষ হলে এটি কয়েক দিন পরে আবার ঝরে যায়।

ধর্মবিদ্বৈষীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আবিষ্কারটি হলো স্রষ্টার ধারণার বিপরীত বা সাংঘর্ষিক। কারণ, আণুবীক্ষণিক গবেষণা স্পষ্ট দেখিয়েছে, মুরগির বাচ্চাটিকে বেরিয়ে আসতে শিং বা দাঁতটি সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে, কাজেই এখানে স্রষ্টার কোনো হাত নেই। এটি একটি হাস্যকর সিদ্ধান্ত। কারণ, বিজ্ঞান আমাদের তথ্যের সাথে আরও কিছু তথ্য যোগ করতে পারে মাত্র; প্রকৃত ঘটনার সমাধান দিতে অপারগ। বিজ্ঞান এখানে খোসা ভাঙা সমস্যাকে শিং গজানোর সমস্যা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বিজ্ঞান কিন্তু এখানে কোনো সমাধান দিতে পারেনি, বড়ো একটি সমস্যার স্থানে আরেকটি সমস্যাকে দাঁড় করিয়েছে। এখন এই প্রশ্ন উঠা খুবই সংগত যে, শিং গজালো কীভাবে? এই ঘটনার যদি প্রথম কারণের দিকে ফিরে যাই, একুশতম দিনে শিং গজাতে হবে—এই অনুভূতি কোথায় থেকে এলো? নিশ্চয়ই এর পেছনে এমন কোনো শক্তি ছিল, যে জানত, ঠিক একুশতম দিনেই এই মাংসপিণ্ডটির জন্য একটি শক্ত শিংয়ের প্রয়োজন হবে—যাতে সে ডিমের খোসার স্তর ভেদ করতে পারে। তাহলে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, কোন সে শক্তি, যে জানে একুশতম দিনে সদ্য সৃষ্টি হওয়া মুরগির বাচ্চাটির একটি শক্ত শিংয়ের প্রয়োজন?

<sup>২৬</sup>. [https://en.wikipedia.org/wiki/Egg\\_tooth](https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_tooth)

০৭

## ইসলাম মুক্তচিন্তার একটি মানদণ্ড

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি—চিন্তা বা বুদ্ধিতে পরম মুক্তি বলে কিছু নেই। আমরা যাকে মুক্তচিন্তা বলি, তা আমাদের পূর্বনির্ধারিত কোনো মানদণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত। অভিজ্ঞতা, যুক্তি, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে মুক্তচিন্তার মানদণ্ড গণ্য করার মধ্য দিয়ে মুক্তচিন্তার ‘মুক্ত’ গুণকে হরণ করা হয়। কারণ, অভিজ্ঞতালব্ধ সকল তথ্যই চূড়ান্ত নয়; ঠিক যুক্তি-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও একই কথা। মানুষের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। বিজ্ঞানও এ সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। তা সত্ত্বেও কথিত মুক্তচিন্তকরা এগুলোকে মুক্তচিন্তার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে।

নিজেকে মুক্তচিন্তক দাবি করে—এমন কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বলো তো মুক্তচিন্তা কীভাবে করবে? সে উত্তর দেবে, মুক্তমনে চিন্তা করব, চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকার করব না। কথাটা চমৎকার; কিন্তু যদি পালটা প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কীভাবে চিন্তা করব? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর আসে, তাতে তাদের কথিত ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটির আর অস্তিত্ব থাকে না।

*Webster's Dictionary*-এর কথাই ধরা যাক। মুক্তচিন্তকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছে—*A Person who thinks freely or independently.* এ পর্যন্ত তো ঠিক ছিল, কিন্তু আরেকটু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুক্তচিন্তক সম্পর্কে যা লিখেছে, তাতে আর মুক্তচিন্তার অস্তিত্ব টিকে থাকে না। *Webster's Dictionary* লিখেছে—

‘One who forms opinions on the basis of reason independently of authority.’

চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া তো ঠিক আছে। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বাধীন হয়ে আবার যুক্তি-বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে কি মুক্তচিন্তার মুক্তিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি?

এ ব্যাপারে অবশ্য কথিত মুক্তচিন্তকদের মনে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। বুদ্ধি দিয়ে অর্জিত সকল চিন্তাকে মুক্ত বলার মানে হলো—বুদ্ধিকে মানদণ্ড নির্ধারণ করা। অথচ যুক্তি-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

জগতের সকল সত্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এবং যৌক্তিক মানেই তা সত্য নয়। বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ সকল জটিলতা ও সমালোচনা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে মুক্তচিন্তার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ওহি কেন বাদ যাবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, কথিত মুক্তচিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তচিন্তার দুটি স্তর পাওয়া যায়। তারা কিছু দার্শনিক ধারণাকে স্থির ধরে নিয়েছেন এবং এ স্থির বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই তাদের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আবর্তিত হয়েছে। যেমন : ওয়েবস্টার অভিধানে যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কোথাও কোথাও বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথাও উচ্চারিত হয়। এসব মানদণ্ডে উন্নীত যেকোনো তথ্যকে গ্রহণ করতে কথিত মুক্তচিন্তকদের কোনো আপত্তি নেই। অন্যদিকে, এসব মানদণ্ডে উন্নীত না হলে তাকে ছুড়ে ফেলতেও তাদের কোনো দ্বিধা নেই।

তাদের এ আচরণ একজন মুমিনের চিন্তাপদ্ধতি থেকে মোটেও উন্নত নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নশ্রেণির। কথিত মুক্তচিন্তকদের সাথে একজন মুমিনের পার্থক্য কেবল এতটুকু যে তারা বিজ্ঞান, যুক্তি বা অভিজ্ঞতাকে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, আর মুমিন ব্যক্তি তার পরিবর্তে ওহিকে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। চিন্তার পদ্ধতিগত দিক থেকে এ দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। গুণগত মান বিবেচনায় ওহি বরং আরও উন্নত। এর কারণ আমরা ‘প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা’ শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব, ইসলামি চিন্তা-পদ্ধতিও কথিত মুক্তমনাদের চিন্তা-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন নয়; বরং একই ধরনের। তারা যেসব ধারণাকে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, ইসলামও অনুরূপ। কাজেই ইসলামও মুক্তচিন্তার একটি মানদণ্ড হতে পারে। তবে এ আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটি বিষয় তুলে ধরব—ইসলাম চিন্তার মুক্তিকে যতটা না প্রাধান্য দেয়, চিন্তার শুদ্ধি নিয়ে তারচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

আমরা দেখেছি—মুক্তচিন্তা মাত্রই তাকে শুদ্ধ বলা যায় না, তেমনি বর্ণনামূলক তথ্যে বিশ্বাস করা মানেই তা অশুদ্ধ নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে—যেখানে মুক্তবুদ্ধির দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছা সম্ভব নয়, কেবল বর্ণনামূলক তথ্যের ওপর বিশ্বাস করেই তা অবগত হওয়া সম্ভব। ধর্মশাস্ত্রের গোঁড়ার কথাগুলো এই সীমানার অন্তর্গত।

স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে মানুষকে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। স্রষ্টার ধারণা মানুষের স্বভাবজাত, স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা থেকে নির্গত। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমেও মানুষ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এখন প্রশ্ন হলো— যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তাহলে তাঁর সত্তা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে জানার উপায় কী হতে পারে? এ বিষয়ে আমরা ‘মুক্তচিন্তা বনাম শুদ্ধচিন্তা’ শিরোনামে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি, মুক্তবুদ্ধির চর্চার দ্বারা এ সকল উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। হয় বলতে হবে—আমাদের এসব উত্তর জানার কোনো প্রয়োজনই নেই, নয়তো ওহিকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

এজন্য ইসলাম শুদ্ধচিন্তাকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিয়েছে। মুক্তচিন্তার সুযোগ দিলে যেখানে একটি বিন্দুতেই যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে ইসলাম ফলাফল আগাম জানিয়ে দিয়ে তাকে বিশ্বাস করা আবশ্যিক করেছে। তবে এ ফলাফলের যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য ইসলাম যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দ্বারও উন্মোক্ত রেখেছে। এজন্য ইসলাম মুক্তচিন্তাকে যতটা প্রাধান্য দেয়, তার চেয়ে বেশি শুদ্ধচিন্তাকে প্রাধান্য দেয়। বলা বাহুল্য, মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্যও শুদ্ধচিন্তা।

এবার পুরো ইসলামি চিন্তা-পদ্ধতিকে মুক্তচিন্তার দৃষ্টিতে দেখা যাক। এখানে আবার স্মরণ করিয়ে দিই—‘মুক্তচিন্তা’ মানে ‘আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা’। কারণ, প্রকৃত বা পরম মুক্তি চিন্তা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে অসম্ভব। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটি এই বিশেষায়িত অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

ইসলাম তার অনুসারীর চিন্তা-বুদ্ধিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে—

১. নিরেট বিশ্বাসের স্থান।
২. বিশ্বাস ও বুদ্ধির সমন্বয়।
৩. উন্মুক্ত চিন্তার ময়দান।

মুফতি তাকি উসমানি (হাফি.) লিখেছেন—

‘আমাদের জানা উচিত, ইসলামি বিধান তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে সেসব বিধান, যেগুলোর ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হবে না; যুগের পরিবর্তনের কারণেও নয়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ওই সকল বিধান, যেগুলোর মধ্যে ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাত-এর সুযোগ রয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সেসব বিধান, যেগুলোর ব্যাপারে শরিয়াহ নিশ্চুপ। শরিয়াহর কোনো নির্দেশনা সেগুলোর ক্ষেত্রে নেই। কুরআন-সুন্নাহ সেসব ব্যাপারে কোনো বিধান দেয়নি। কেন দেয়নি? যেহেতু শরিয়াহ এ সকল বিষয়কে আমাদের বুদ্ধির ওপরে ন্যস্ত করেছে। তৃতীয় এই বিভাগের বিস্তৃতি এত বিশাল যে, মানুষ প্রত্যেক যুগে নিজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে এ খালি ফিল্ডে উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করতে পারবে। যুগসমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবে।’<sup>২৭</sup>

এই তিনটি বিষয়ে গভীর আলোচনা করলে ফুটে উঠবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিবৃত্তির অবস্থান।

## নিরেট বিশ্বাসের স্থান

আমরা দেখেছি, কথিত মুক্তমনারাও কোনো একটি বিষয়কে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। খোদ মুক্তচিন্তা শব্দটিও এই দোষে দুষ্ট। মুক্তচিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হলো—মানুষের বুদ্ধি বা

<sup>২৭</sup> মুফতি তাকি উসমানি, *ইসলাহি খুতুবা*-১/৪১-৪২ [দারুল উলুম লাইব্রেরি]



চিন্তাকে সর্বাবস্থায় সঠিক বিবেচনা করা। অথচ মানব-বুদ্ধি সর্বদা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে না, কখনো দিক্‌ভ্রান্তও হয়। কাজেই মুক্তচিন্তা শব্দটির মধ্যেই একটি নিরৈট বিশ্বাসের স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের যাবতীয় জ্ঞান-গবেষণা এই নির্ধারণের বাইরে যেতে পারে না। ইসলামও জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নিরৈট বিশ্বাসের সীমানা নির্ধারণ করেছে। ইসলাম ওহিকে সত্য বলে ঘোষণা করে, জ্ঞানের মানদণ্ড ঘোষণা করে। কোনো কিছু ওহি দ্বারা সাব্যস্ত হলে নির্দিধায় তা গ্রহণ করে। দেখার বিষয় হলো— ওহিতে সাব্যস্ত বিষয়গুলোর কতটুকু বুদ্ধিবৃত্তিক আর কতটুকু বুদ্ধিবৃত্তিক নয়। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.)-এর মতে পুরো কুরআনের আলোচনা পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—

১. হুকুম-আহকাম বা বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনা,
২. তর্কবিদ্যা
৩. আল্লাহর নিয়ামত উল্লেখ করে উপদেশ প্রদান
৪. বিভিন্ন ঘটনাবলির উল্লেখ করে উপদেশ প্রদান ও
৫. মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে উপদেশ প্রদান।<sup>২৮</sup>

মুফতি তাকি উসমানি (হাফি.)-এর মতে, কুরআনুল কারিমের বিষয়বস্তু চারটি—

১. আকাইদ
২. আহকাম বা বিধিবিধান
৩. ঘটনাবলি ও
৪. বিভিন্ন উপমা।<sup>২৯</sup>

আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে আকাইদ-ই কেবল নিরৈট বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, বাকিগুলো নিরৈট বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন : বিভিন্ন হুকুম আহকামের যথার্থতা বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব এবং ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় বহু গবেষক এর পেছনে ছুটেছেন। তাঁরা ইসলামের সকল বিধিবিধানের যৌক্তিক হেতু সন্ধান করেছেন। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) রচিত *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* বিশেষভাবে পরিচিত। মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি (রহ.) *রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ* নামে পাঁচ খণ্ডে এর একটি দীর্ঘ ভাষ্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। আশরাফ আলি খানভি (রহ.)ও এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। *আহকামে ইসলাম আকল কি নয়র ম'য়* শিরোনামে লেখা গ্রন্থটিতে শরিয়াহর বিভিন্ন বিধিবিধানের যৌক্তিকতা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়া পূর্ববর্তী আলিমগণও এ বিষয়ে কলম ধরেছেন।

<sup>২৮</sup>. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, *আল-ফাউজুল কাবির*

<sup>২৯</sup>. মুফতি তাকি উসমানি, *উলুমুল কুরআন*



০৮

## ইসলামে মুক্তচিন্তা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা মুক্তচিন্তা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছি। ইসলাম তার অনুসারীকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় কতটুকু স্বাধীনতা দেয়, সে আলোচনা গত হয়েছে। ইসলামও যে মুক্তচিন্তার একটি মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হতে পারে, তা সেখানে তুলে ধরেছি। পূর্বের অধ্যায়ে যে তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, এ অধ্যায়ে আমরা তারই ব্যবহারিক দিক আলোচনা করব। মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলাম কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আলোচনা করে কুরআন, সিরাতুন নবি ও সাহাবাগণের জীবন পর্যালোচনা করে দেখব, সেখানে কতটা মুক্তির নিদর্শন ছিল। এরপর ওইসব শাস্ত্রের দিকেও নজর দেওয়ার সুযোগ পাব—যা চৌদ্দশো বছর যাবৎ মুসলিম সমাজের চিন্তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। এ উদ্দেশ্যে ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের উসুলের পাশাপাশি ইলমুল কালাম ও মানতিকের গঠন প্রণালি ও ইসলামি চিন্তা-পদ্ধতিতে এসব শাস্ত্রের গুরুত্বও আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ে।

### কুরআনুল কারিম মুক্তচিন্তা

কুরআনুল কারিম মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ প্রত্যাদেশ। তিনি মানুষকে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার পথপরিক্রমা ঐকে দিয়েছেন এ গ্রন্থে। যেহেতু এটি সেই সত্তা প্রেরণ করেছেন—যিনি মানুষের স্রষ্টা এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, কাজেই এর বর্ণনারীতিতে সেই দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে, যা মানুষের জন্য সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। এখানে শব্দ ও ছন্দের ঝংকার, বর্ণনার শৈল্পিকতা, অদৃশ্যের বর্ণনা ও ভবিষ্যদ্বাণীসহ এমন সব বিষয়কে স্থান দেওয়া হয়েছে—যাতে প্রমাণিত হয়, এটি স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারও রচনা হতে পারে না।

মুক্তচিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা মানুষের মৌলিক স্বভাব। মানুষের এ স্বভাব সম্পর্কে স্রষ্টা সর্বাধিক জ্ঞাত। কাজেই মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত গ্রন্থে তিনি ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান রেখেছেন। এতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি মানবজাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে যেমন যুক্তি ব্যবহার করেছেন, নিজের তাওহিদ প্রমাণেও তেমনি যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

যারা তাঁর সন্ধান পেতে চায়, তাদের জন্যও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক নিদর্শনের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি ইবরাহিম ؑ-কে উপস্থাপন করেছেন একজন জীবন্ত মুক্তচিন্তক হিসেবে, যিনি তাঁর জাতির সাথে বিদ্রোহ করেছিলেন। বংশপরম্পরায় লালন করে আসা জাতির বিশ্বাসকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম ؑ-এর ঘটনাকে নিছক গল্প হিসেবে বর্ণনা করেননি; বরং তাঁকে মুমিনদের পিতা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি মুমিনদের ইবরাহিম ؑ-এর মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করেছেন। এ সবই প্রাচীনভাবে মুক্তচিন্তার খোরাক জোগায়। কুরআনের এই চরিত্র এখানে খানিকটা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তারা কি ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য? তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।’<sup>৩০</sup>

আল্লাহ তায়ালা এখানে মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী করে তুলতে যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা পুরোপুরি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। তাঁর প্রতি যাদের সংশয় রয়েছে, তাদের প্রতি সহজ সরল পথনির্দেশনা—প্রকৃতিকে, তাঁর নিয়ম ও ছন্দকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করো, এর শৈল্পিক সৌন্দর্যকে অবলোকন করো। তার পরেই বুঝে আসবে, একটি নিরেট রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বোধসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব অসম্ভব।

বস্তুত এটিই স্রষ্টার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, বিজ্ঞানের ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে যা আরও প্রকট হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান আমাদের প্রতিনিয়ত প্রকৃতির নতুন কিছু নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিয়ে চলছে। এতে আল্লাহ তায়ালা এই আহ্বানের যুক্তিকতা আরও প্রকট হচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই স্রষ্টার প্রমাণ হিসেবে আরও বহু যুক্তি দেওয়া গেলেও কুরআনুল কারিম এই একটির ওপরেই বারবার জোর দিয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘যিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। কাজেই দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ফাটল দেখতে পাও কি?’<sup>৩১</sup>

কুরআন সৃষ্টিকে নিখুঁত দাবি করার সাথে সাথে এ দাবিকে পরীক্ষা করার জন্য আহ্বানও জানিয়েছে। দাবিকে জোড়ালো করতে দ্বিতীয়বার আবার একই কথা বলা হয়েছে—

‘অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।’<sup>৩২</sup>

৩০. সূরা রুম : ৮

৩১. সূরা মুলক : ৩

৩২. সূরা মুলক : ৪

এখানে একই সঙ্গে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। কুরআন তার দাবি প্রসঙ্গে যেমন জোরালো, তেমনি কোনো দাবিকে গ্রহণ করার আগে পরীক্ষা করার ব্যাপারেও পরামর্শ দিচ্ছে। ২৯ পারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোর মৌলিক আলোচ্য বিষয়ও বলতে গেলে এটিই। এ অংশে মূলত আল্লাহ তায়ালার প্রতি আহ্বানে বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২৯ পারার শুরুতে সূরা মুলককে এ বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকাও বলা যেতে পারে। সূরা মুলকের শুরুর কয়েকটি আয়াতের দিকে লক্ষ করা যাক—

‘মহিমাম্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ত, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য— কর্মে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; দেখ, কোনো খুঁত দেখতে পাও কি?

অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফেরাও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।’<sup>৩৩</sup>

আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালার নাম সরাসরি উচ্চারণ করা হয়নি; বরং প্রকৃতির রহস্যগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতে বলা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—সর্বশক্তিমান সত্তা, জীবন-মৃত্যুর রহস্য, সৎকর্ম বা মানবিক মূল্য, সৃষ্টির শৈল্পিক সৌন্দর্য ও এর নিখুঁত ছন্দ। বলা বাহুল্য, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে গবেষণা আমাদের অনিবার্যভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এজন্যই এই সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

‘তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম বা বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।’

স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবনের জন্য আমরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই পবিত্র কুরআনের আরও বহু স্থানে। সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে দেখে না, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ করে না যে, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের প্রতি কি লক্ষ করে না, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে কি দৃষ্টি দেয় না, তা কীভাবে সমতলে বিছানো হয়েছে?’<sup>৩৪</sup>

<sup>৩৩</sup>. সূরা মুলক : ১-৪

<sup>৩৪</sup>. সূরা গাশিয়াহ : ১৭-২০

সূরা তুরে আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও রিসালাতকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রমাণ করেছেন। এ আলোচনার শুরু হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পদ্ধতির ঘোষণা দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কী তাদের এ আদেশ দিচ্ছে, নাকি তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?’<sup>৩৫</sup>

আল্লাহ তায়ালা এখানে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতের প্রমাণ-পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন, আর তা হলো—বুদ্ধিবৃত্তি। এখানে বুদ্ধিবৃত্তি শব্দের সাথে ‘আদেশ’ শব্দ যোগ করে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকে এতটাই জোর দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনের বক্তব্য অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া কেবল অনুধাবন সৃষ্টি করে না; বরং আদেশ করে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে। আয়াতের পরবর্তী অংশ নির্দেশ করে যে, সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে তার বুদ্ধিবৃত্তি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; বরং বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে তারা প্রবৃত্তির গোলামি করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ-পদ্ধতির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা যে আলোচনা শুরু করেছেন, আমরা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। পরের আয়াতে খুব সাধারণ ও প্রাথমিক একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন—‘কুরআনের রচয়িতা কে?’ এ প্রশ্নে মক্কার কাফিররা বলত—নবি কারিম ﷺ-ই কুরআন রচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ প্রশ্ন উদ্ধৃত করে নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিয়েছেন—

‘নাকি তারা বলে, “এ কুরআন সে বানিয়ে বলেছে?” বরং তারা ঈমান আনবে না।

অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এটার মতো কোনো বাণী নিয়ে আসুক না!’<sup>৩৬</sup>

এখানে নিতান্ত সাদামাটা সহজ উত্তর দেওয়া হয়েছে—যা বুঝতে কোনো জটিল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এটা যদি আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতে তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে এর সমকক্ষ কোনো গ্রন্থ রচনা করে অথবা অনুরূপ একটি সূরা হলেও রচনা করে প্রমাণ করে দাও, এ বাণীর সমকক্ষ বাণী মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে চৌদ্দশো বছরে বহু বড়ো বড়ো কবি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে এবং তাদের ব্যর্থতা ও স্বীকারোক্তি ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। শুধু মুসলমানদের লিখিত ইতিহাসগ্রন্থে নয়; বরং অমুসলিম ইতিহাসবিদগণের গ্রন্থেও এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায়।

যদি এসব তথ্যের সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এ চ্যালেঞ্জ কোনো কালের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পৃথিবীর শেষ মানুষটির জন্যও প্রযোজ্য। ইসলামকে ভুল প্রমাণ করতে বা কুরআনকে ঐশী বাণী হিসেবে অস্বীকার করতে এত জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই। কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারলে কুরআন ও পুরো ইসলামি বিশ্বাস স্বঘোষিত মানদণ্ডে ভুল প্রমাণিত হবে।

<sup>৩৫</sup>. সূরা তুর : ৩২

<sup>৩৬</sup>. সূরা তুর : ৩৩-৩৪

০৯

## মুসলিম মানসে মুক্তচিন্তা

স্বাধীতার চেতনা মুসলিম মানসের আদি বৈশিষ্ট্য। নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও পেছনের প্রায় চৌদ্দ শতকের কখনোই এ বৈশিষ্ট্য মুসলিম উম্মাহর হাতছাড়া হয়নি। গোঁড়া তাকলিদ বা অন্ধভক্তি কখনো কখনো মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও উম্মাহর আলিমগণ শক্ত হাতে এসব গোঁড়ামিকে প্রতিহত করেছেন। এজন্য পৃথিবী একদিনের জন্যও মুক্তচিন্তক মুসলিম আলিম থেকে বঞ্চিত হয়নি। মুক্তচিন্তার যত উপাদান আছে, এর ফলাফল হিসেবে যা কিছু অবধারিত, তার সবই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জড়িয়ে আছে। তর্ক-বিতর্ক, মতভিন্নতা, পরমত সহিষ্ণুতা—এসব বিষয়াদি ইসলামি সংস্কৃতির নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ অধ্যায়ে এই বিষয়েই আমরা আলোচনা করব।

### ইখতিলাফ : মুক্তচিন্তার অনিবার্য পরিণতি

ইখতিলাফ বা পরস্পর মতভিন্নতা মুক্তচিন্তার পূর্বশর্ত, অনিবার্য ফলাফলও বটে। মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন। তাই স্বাধীন ও মুক্ত গবেষণার ফলাফলে ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। মতভিন্নতা না থাকলে বুঝতে হবে, কোনো স্থানে নিশ্চয় অন্যকে অন্ধ অনুকরণের একটি প্রবণতা রয়ে গেছে।

মতভিন্নতা ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই ইসলামি সমাজ ও সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়। খোদ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেও সাহাবাগণের মধ্যে ফিকহি বিষয়ে মতভিন্নতার নজির পাওয়া যায়। তিনি সেগুলো নির্মূল করার পরিবর্তে উম্মাহর জন্য রহমত হিসেবে ঘোষণা করেন।

খোদ কুরআনুল কারিমের পাঠ-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ভিন্নতার অবকাশ রেখে কুরআনের সাত হরফকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে কুরআনের বাক্যগুলো শুধুই একটি বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি বরং এতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সীমার মাঝে বিভিন্নভাবে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন—

‘নিশ্চয় এ কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং সেগুলোর মধ্য থেকে সহজসাধ্য পন্থায় পাঠ করো।’<sup>৩৭</sup>

অর্থের দিক থেকে এ হাদিসটি মুতাওয়াতির। সাহাবাগণের একটি বিরাট দল এই অর্থে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় উবাই ইবনে কাব রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সঃ বনু গিফারের কূপের কাছে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট জিবরাইল আঃ এলেন। তিনি বললেন—

‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনার উম্মত যেন এক হরফেই কুরআনুল কারিম পাঠ করে। এতে তিনি বললেন—“আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত এতে সমর্থ হবে না।” অতপরঃ জিবরাইল আঃ দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট এলেন। বললেন—“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনার উম্মত যেন দুই হরফে কুরআনুল কারিম পাঠ করে।” ...চতুর্থবার আবার জিবরাইল আঃ এলেন এবং বললেন, “আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনার উম্মত যেন সাত হরফে কুরআনুল কারিম পাঠ করে। অতপরঃ তারা যে হরফেই পাঠ করবে, তাদের কিরাত সঠিক হবে।”<sup>৩৮</sup>

এই সাত হরফের মর্মার্থ যে কী, তা নিয়ে মতানৈক্য কম নয়। প্রথম যুগের আলিমগণের মধ্যে যেমন এ নিয়ে বিতর্ক ছিল, তেমনি শেষ যুগেও। এমনকী আল্লামা ইবনুল আরাবি (রহ.) এ ব্যাপারে পঁয়ত্রিশটি মতামত একত্রিত করেছেন।<sup>৩৯</sup>

হাফেজ ইবনে জারির তাবারি (রহ.) সহ কিছু আলিম সাত হরফ দ্বারা আরবের সাত গোত্রের সাত ভাষাকে বুঝেছেন। যেহেতু আরবরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের ভাষা আরবি হওয়া সত্ত্বেও অন্য গোত্রের ভাষার সাথে সামান্য গড়মিল ছিল। এই গড়মিল ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্যের মতো। বিভিন্ন গোত্রের সহজতার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমকে সাত ভাষায় নাজিল করেছেন, যেন প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ ভাষায় পাঠ করতে পারে।<sup>৪০</sup>

দীর্ঘ আলোচনার পর আল্লামা তাকি উসমানি (রহ.) তাঁর উলুমুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম মালেক (রহ.) ও তাঁর সমর্থকদের অভিমতকে যথার্থ ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেন। এ মতানুসারে সাত কিরাত অর্থ সাতটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের অবকাশ। এগুলো হলো—একবচন ও বহুবচনে পার্থক্য, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের ভিন্নতা, কারক ও বিভক্তির ভিন্নতা, শব্দ প্রকরণের ভিন্নতা,

৩৭. সহিহ বুখারি : ২২৮৭, মুসলিম : ৮১৮

৩৮. মানাহিলুল ইরফান ১/১৩৩

৩৯. জারকাশি, আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন ১/২১২

৪০. তাফসিরে তাবারি ১/১৫



অব্যয় পদের ভিন্নতা, অক্ষরের পরিবর্তন ও সুরভঙ্গিমার বিভিন্নতা। যেমন : وَتَبَّتْ كُرْبَةً رَبَّكَ-এর পরিবর্তে বহুবচনে وَتَبَّتْ كُرْبَتُكَ رَبَّكَ; পড়া যায়; وَتَبَّتْ كُرْبَةً رَبَّكَ-এর লিঙ্গ পরিবর্তন করে وَتَبَّتْ كُرْبَتُكَ পড়া যায়।

মোটকথা, সাত হরফের ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, এটি স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের মধ্যেও পঠনরীতির ভিন্নতাকে সহ্য করা হয়েছে। এমনকী সহজীকরণের লক্ষ্যে নবুয়তের শুরুর দিকে সমার্থক শব্দযোগে কুরআন তিলাওয়াতকেও ব্যাপকভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে; যদিও এ ধরনের সমার্থক শব্দের ব্যবহারের সুযোগ বর্তমানে বিরল। যখন উসমান রা কুরআন সংকলন করেন, তখনও এতে এমন ব্যবস্থা রাখেন, যেন সাত হরফেই কুরআন পড়া যায়। এজন্য তিনি সংকলিত কপিটিতে কোনো নুকতাও ব্যবহার করেননি।<sup>৪১</sup>

সাত হরফ ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিরাতের বিভিন্নতাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাত ক্বারির কিরাত প্রসিদ্ধি পেলেও প্রায় চৌদ্দজন ক্বারির কিরাতের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের দশজনের কিরাতের বিশুদ্ধ সনদ অনুযায়ী মুতাওয়াতির, বাকিগুলো শাজ বা বিরল। এ সকল কিরাত সংকলনের জন্য বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।<sup>৪২</sup>

এ আলোচনা থেকে দেখা যায়—কুরআনের মতো এত স্পর্শকাতর একটি ক্ষেত্রেও ইসলাম সহজীকরণের জন্য তিলাওয়াতের বিভিন্নতাকে ধৈ রেখেছে, তিলাওয়াত ও পঠন-পাঠনে মতানৈক্যেও বৈধতা দিয়েছে। কুরআনের কিরাত বা পাঠপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার দরজাকে খোলা রেখেছে, মতপার্থক্যকারীদের পরস্পরকে সঠিক বলেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

জ্ঞান-গবেষণায় পরস্পরের মতভিন্নতাকে বৈধতা দেওয়ার নজির রাসূল স-এর জীবদ্দশাতেও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বনু কুরায়জায় প্রেরিত দলের মধ্যকার ফিকহি মতভিন্নতা এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য।

খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরায়জা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি লঙ্ঘন করার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাদের অপরাধের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোষণা করে—‘তোমরা দ্রুত প্রস্তুত হও এবং বনু কুরাইজার উদ্দেশে রওনা করো।’ তিনি এটাও বললেন, কেউ যেন বনু কুরায়জা পৌছার আগে সালাত আদায় না করে। পথে আসরের সময় হলে একদল সাহাবি নামাজ আদায় করল এবং অপর দল করল না। দ্বিতীয় দলের যুক্তি ছিল রাসূল স-এর নির্দেশ। আর প্রথম দল নির্দেশ দ্বারা ‘বিলম্ব না করে দ্রুত পৌছা’ উদ্দেশ্য নিয়েছে। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ স কোনো দলকে তিরস্কার করেননি।<sup>৪৩</sup>

<sup>৪১</sup>. মুফতি তাকি উসমানি, উলুমুল কুরআন, মাকতাবাহ দারুল উলুম করাচি, ১০৬-১৫৮ পৃ.

<sup>৪২</sup>. মানাহিলুল ইরফান ১/৪৬০

<sup>৪৩</sup>. সহিহ বুখারি : ৯৪৬, ৪১১৯

আবু সাইদ খুদরি রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

‘দুজন ব্যক্তি সফরে বের হন। পথে সালাতের ওয়াক্ত হয়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অজু করার মতো কোনো পানি ছিল না। ফলে তাঁরা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন। এরপর সালাতের সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনই পানি পেলেন। তাঁদের একজন অজু করে আবার সালাত আদায় করলেন, কিন্তু অপর ব্যক্তি তা করলেন না। রাসূলুল্লাহ সঃ এ ঘটনা শোনার পর যিনি আবার সালাত আদায় করেননি, তাঁকে বললেন—“তুমি সঠিক নিয়মই পালন করেছ। তোমার ওই সালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট।” আর যিনি অজু করে আবার সালাত আদায় করেন, তাঁকে বলেন—“তোমার জন্য দুইবার পুরস্কার রয়েছে।”<sup>৪৪</sup>

মতপার্থক্যের এ গণ্ডি কেবল সাহাবিদের পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; কখনো কখনো তা রাসূলুল্লাহ সঃ পর্যন্তও গড়াত। আপতদৃষ্টিতে মনে হয়— কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা খোদ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে পর্যন্ত মতপার্থক্য দেখিয়েছেন। বদরের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শে উমর রাঃ-এর ভূমিকা, বদরের যুদ্ধে মুসলিম শিবিরের যায়গা নির্ধারণের ঘটনা এবং বারিরার ঘটনা এদিকেই ইঙ্গিত করে। এ সকল ঘটনা আমরা পেছনের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত বলে এসেছি।

উমর রাঃ-এর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে—যেখানে তিনি রাসূল সঃ-এর সাথে মতভেদ করছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মতের সাথে সংযোজন বা বিয়োজন করছেন। আর এ সকল আচরণকে রাসূল সঃ অপছন্দ করেননি; বরং মনে হয়েছে তিনি পছন্দ করছেন।

মতভিন্নতাকে সহ্য করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মুসলিম বিশ্বে চারটি ফিকহি মাজহাব এখনও বিদ্যমান। এর বাইরেও প্রচলিত মতাদর্শের অন্ত নেই। এসবই সেই একই মূলনীতির ফলাফল—ইখতেলাফকে সহ্য করা এবং এর শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রদান করা।

ইসলামের ইতিহাসে দল-উপদলের মোট সংখ্যার কোনো হদিস নেই—খারিজি, রাফিজি, মুতাজিলা, শিয়া, জাহমিয়া সহ আরও বহু দল-উপদল ইসলামি ইতিহাসের পাতাকে পূর্ণ করেছে। এদের কোনো কোনোটি রাজনৈতিক হলেও সকলের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তিক একটি জাগরণ ছিল। প্রত্যেকটি দল-উপদলই নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত ভিত্তির ওপরে দাঁড় করেছিল। কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এসব দল-উপদল আহলুস-সুন্নাহ কর্তৃক পরিত্যাজ্য হলেও এদের উপস্থিতিই একটি সত্যের ঘোষণা দেয় যে, ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রবণতা শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে সময়ের প্রয়োজনে ‘ইলমুল কালাম’ নামে আলাদা শাস্ত্রেরই গোড়াপত্তন হয়।

<sup>৪৪</sup>. আবু দাউদ : ৩৩৮



১০

## পুনশ্চ

ইসলাম ও মুক্তচিন্তার সম্পর্ক নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। এ আলোচনা নানা দিকে ঘুরে-ফিরে এতটাই লম্বা হয়েছে, এর একটি সারসংক্ষেপ উপস্থান করা প্রয়োজন মনে করছি। আমরা দেখেছি, ‘মুক্তচিন্তা’ ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছিল চার্চের বিপক্ষে ধর্মসংস্কারের একটি আন্দোলন হিসেবে। তাই শব্দটির উৎপত্তিগত মালিকানা ধর্মসংস্কারকদের। খুব বেশি হলে ঈশ্বরবাদ পর্যন্ত এর অংশ পৌঁছেছিল। শুরুতে যারা মুক্তচিন্তার ধারণা সৃষ্টি করেন, এ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁরা বরং নাস্তিকদের অঙ্ক বলতেন। যেমন : কলিস বলতেন, ‘মূর্থতাই নাস্তিকতার ভিত্তি, আর মুক্তচিন্তাই এর একমাত্র আরোগ্য।’ কাজেই শব্দটির ওপরে উৎপত্তিগতভাবে নাস্তিকদের কোনো অধিকার নেই।

এরপরে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়। চার্চের সাথে একটু-আধটু দ্বিমত পোষণকারী থেকে শুরু করে গোঁড়া নাস্তিক পর্যন্ত এ শব্দের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে থাকে। কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে প্রায় সব কটি অভিধানেই একে নাস্তিকতার সমার্থক এবং ধর্মে বিশ্বাসীর বিপরীত শব্দ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর চেয়ে ভয়ংকর কথা হলো—ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রই তাকে গোঁড়া বলার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আমরা এ ধারণার গোড়াতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, মুক্তচিন্তা কি আদৌ সম্ভব?

আমরা দেখেছি, মানব সন্তানের পক্ষে প্রকৃত অর্থে মুক্তচিন্তক হওয়াই সম্ভব নয়। কারণ, চিন্তা বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরম মুক্তি অসম্ভব। কেউ যখন চিন্তা করে, তখন তিনি তার অতীত অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে পৃথক হয়ে চিন্তা করতে পারেন না। চিন্তা বা বুদ্ধি কোনো তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয়; বরং ব্যক্তির অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সামষ্টিক বহিঃপ্রকাশ।

এজন্য কেবল একটি শিশুর চিন্তাই প্রকৃত অর্থে মুক্ত হতে পারে। শিশুর মনকে কোনো কোনো দার্শনিক ‘ট্যাবুলা রাসা’ বা ‘নিদাগ স্লেট’ বলে উপস্থান করেছেন। এ হিসেবে সদ্যপ্রসূত শিশুর মন সম্পূর্ণ মুক্ত; তার চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। অবশ্য কোনো কোনো দার্শনিক এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে,

শিশুর মনেও কিছু সহজাত ভাব (Innate Idea) থাকে। এই মতকে বিবেচনায় আনলে হয়তো শিশুর চিন্তাকেও মুক্ত বলার কোনো উপায় থাকে না। অর্থাৎ, আমাদের চিন্তাকে কখনোই মুক্তির মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। আমরা যাকে মুক্তচিন্তা বলি, তা প্রকৃত অর্থে মুক্ত নয়; বরং আপেক্ষিকভাবে মুক্ত। এ ধরনের চিন্তাকে আমরা নাম দিতে পারি আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা।

আমরা দেখেছি, শিশুর চিন্তাগুলো মুক্ত হলেও সঠিক নয়। কাজেই মুক্তচিন্তা মাত্রই তা শুদ্ধচিন্তা নয়। এ থেকে আমরা অনুধাবণ করেছি, জ্ঞানের সত্যাসত্য মুক্তচিন্তার ওপরে নির্ভরশীল নয়; বরং সত্য চিরদিন সত্য, যদিও তা বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়; আর মিথ্যা চিরদিন মিথ্যা; যদিও তা মুক্তচিন্তার ফল হয়। এই পর্যায়ে এসে আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, সত্যে পৌঁছাতে আমাদের কোনটি বেশি প্রয়োজন—মুক্তচিন্তা নাকি শুদ্ধচিন্তা?

এ প্রশ্ন আমাদের অনিবার্যভাবে মুক্তচিন্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে শুদ্ধচিন্তার দিকে মনোযোগী হতে বাধ্য করেছে। শুদ্ধচিন্তা বা বুদ্ধির মানদণ্ড কী তা নির্ণয় করতে আমরা জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ করেছি। এখানেই আমরা অভিজ্ঞতাবাদ, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও ওহিকে আলোচনা করেছি শুদ্ধচিন্তা ও একই সঙ্গে আপেক্ষিক মুক্তচিন্তার মানদণ্ড হিসেবে। এ আলোচনায় আমাদের নিকটে ধরা পরেছে অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বিশ্বাস—প্রত্যেকের গ্রহণযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা।

বিজ্ঞানের আলোচনাতে আমরা দেখেছি—এটি অভিজ্ঞতা ও যুক্তির পাশাপাশি বিশ্বাসের ওপরেও কতটা নির্ভরশীল। একই সঙ্গে বিজ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতাও আমরা লক্ষ করেছি। বিজ্ঞান আমাদের সামনে কোনো বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারে না। বিজ্ঞান সব বিষয়েও প্রস্তাব করতে পারে না; বরং কিছু সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে এর যাবতীয় প্রস্তাবনা। যেমন : বিজ্ঞান মানবিক মূল্য, শিল্প-সাহিত্য, প্রেম, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না।

এখান থেকে আমরা ওহির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। ওহি আমাদের যে জ্ঞান প্রদান করে, তা আমরা অন্য কোথাও থেকে পেতে পারি না। বিজ্ঞান এ নিয়ে আলোচনাই করে না। দর্শন ধর্মীয় অনেক প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু তার এ আলোচনা নিছক অনুমাননির্ভর। এর কোনো শক্তিশালী প্রমাণ যেমন নেই, তেমনি কোনো মজবুত ভিত্তিও নেই। ফলে আমাদের এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনিবার্যভাবে ধর্মের নিকটে ফিরে যেতে হয়। ধর্মকে বাদ দিয়ে নিশ্চিতভাবে এসব বিষয় সম্পর্কে জানা অসম্ভব।

যারা এসব তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা বা খোদ স্রষ্টা সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করে, তাদের বিভ্রান্তিও আমরা তুলে ধরেছি। স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নাস্তিকরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তা যে নিতান্তই অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নির্গত, আমরা তা দেখেছি এ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। আমরা উপলব্ধি করেছি, স্রষ্টা মহাবিশ্বের অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তাঁর অস্তিত্ব স্বপ্রমাণিত, নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। কারণ, স্রষ্টাকে অস্বীকার করলে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের কোনো

প্রমাণ বাকি থাকে না। স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে মানবজ্ঞানেরও ভিত্তি নড়ে যায়। স্রষ্টা অপ্রমাণিত হলে মানুষের জ্ঞানের নিশ্চয়তা ও জানার সামর্থ্যও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

মানবিকতা, মানবিক মূল্য, নীতি-নৈতিকতা—এ সবই স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্বহীন। কাজেই আমাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে এবং মহাবিশ্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জীবনের মূল্য ও অর্থের জন্য আমাদের অনিবার্যভাবে ওহির নিকটেই ছুটে যেতে হয়।

এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে, ওহির প্রামাণ্যতা কী? এটি যে সত্যই স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তার প্রমাণ কী? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা ওহির বিশুদ্ধতা পরিমাপের তিনটি মানদণ্ড প্রদান করেছি, যা অনিবার্যভাবে ওহির প্রামাণ্যতা যাচাই করতে পারে—(ক) যার নিকট থেকে ওহি প্রেরিত অর্থাৎ স্রষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারে কি না, (খ) গ্রন্থের আদ্যোপান্তের কোথাও স্ববিরোধী বক্তব্য বা কোনো প্রকারের ভুল আছে কি না এবং এটি যে স্রষ্টার নিকট থেকে অবতীর্ণ, তার কোনো নিদর্শন আছে কি না। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো উপাদান আছে কি না, যা মানব সামর্থ্যের বাইরে। এ তিনটি মানদণ্ড দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো গ্রন্থ সম্পর্কে বলা যাবে, এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং অবিকৃত কি না। কাজেই ওহির প্রামাণ্যতা নিয়েও আমাদের সংশয় প্রকাশের কিছু নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াতেই ওহির ঐশী প্রকৃতিকে প্রমাণ করা যায়।

আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে ইসলামকে বিশ্লেষণ করে। মুক্তবুদ্ধির চোখ দিয়ে আমরা ইসলামকে পরখ করেছি। ইসলাম তার অনুসারীকে সৃজনশীলতার দিকে আহ্বান করে, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে উৎসাহিত করে। ইসলামের বুনিয়াদি সব বিষয়গুলোতেও বুদ্ধিবৃত্তির একটা বিরাট দখল আছে। উসুলুল ফিকহ, ফিকহ, মানতিক প্রভৃতি এর জ্বলজ্যন্ত প্রমাণ। তাত্ত্বিকতা ছাড়িয়ে ব্যবহারিক জীবনে আলিমগণের পরস্পর ইখতিলাফ প্রমাণ করে মুসলিম মনীষার মনোজগৎ কতটা প্রশস্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য কতটা উর্বর ছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকাফেলা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচরণের দিকে তাকালেও দেখা যায়, মুক্তবুদ্ধির কতটা নির্মল বায়ু প্রবাহিত হতো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁদের মুক্তচিন্তার প্রতিফলনই পাই আমরা মুসলিম আলিমগণের লেখনী ও জীবনাচারে। এখানে আবার মনে করিয়ে দিই, মানুষের চিন্তা পুরোপুরি নির্মোহ হতে পারে না। চিন্তা বা বুদ্ধিতে পরম বা চরম মুক্তি অসম্ভব। আমরা কেবল আপেক্ষিকভাবে মুক্ত হতে পারি, সে অর্থেই ‘মুক্তচিন্তা’ শব্দটিকে গ্রহণ করতে পারি। যারা মুক্তচিন্তক, তারা এ অর্থেই মুক্তচিন্তক।